লোকটা

গৌরকিশোর ঘোষ

রূ প রে খা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
অরবিন্দ ভৌমিক
রূপরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

রূপরেখা
প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬১

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

অম্লান
আর
কিটি-কে

লোকটা

১

লোকটা দেখল সামনের বাসটা হঠাৎ বাঁ-দিকে মোড় নিল। তার পিছন থেকে ট্যাকসিটা তীব্র বেগে সোজা তাদের দিকে ছুটে এল। ড্রাইভারের পাশে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সে বসেছিল। দেখল, কেমন নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়ে এল ট্যাকসিটা। শুনল, ড্রাইভারটা কেমন একটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে কি বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকসিটার হেডলাইট, বাম্‌পার, বনেট, উইনড্‌স্ক্রীনের বড় কাঁচখানা আর তার পিছনে বসা আবছা কয়েকটা মূর্তি সটান তাদের গাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।

তাদের গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে উড়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু আশ্চর্য লোকটার কানে এক ফোঁটা আওয়াজ ঢুকল না, শুধু এইটুকু বোধ করল, চকিতে তার শরীরে প্রচণ্ড একটা ওলোট-পালোট হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে যখন দেখল তাদের গাড়ির পলকা বডি, ইনজিন, ড্যাসবোরড, ষ্টীয়ারিং হুইলটা তাদের

দিকেই এগিয়ে এল, হুড়মুড় করে একেবারে বুকের কাছে, তখন এই তামাসাটাও সে ড্রাইভারকে ডেকে দেখাতে চাইল। কিন্তু ড্রাইভারটার কাণ্ড দেখে তার কেমন হাসি পেল। এরই মধ্যে ড্রাইভারটা ঘুমে একেবারে ঢুলে পড়েছে। সমস্ত শরীরটা এলিয়ে গিয়েছে, তার মুখটা কেমন লম্বা হয়ে এসেছে, ষ্টীয়ারিং হুইলটা এগিয়ে এসে ওর বুকটা যদি জোরে ঠুসে না ধরত, তা হলে ও ব্যাটা নির্ঘাত গড়িয়ে তার গায়ে পড়ত।

হঠাৎ লোকটার মনে হল, উঃ, বাতাস নেই, বাতাস নেই, বাতাস নেই। যন্ত্রণার এক ঝাঁক শকুন চোখের পলক না ফেলতেই তার উপর ছোঁ দিয়ে পড়ল, তারপর ঠোঁটে করে মহাশূন্যের উপরে তুলে নিয়ে তাকে আলতোভাবে ছেড়ে দিল।

লোকটা ভোঁ-কাটা ঘুড়ির মত মোলায়েমভাবে ভাসতে ভাসতে নামতে নামতে বিড় বিড় করে বলল, "নাঃ, সিদ্ধান্ত এবারে একটা নিতেই হবে। যতই অপ্রীতিকর হোক, সমস্যার মুখোমুখি হওয়াই মনুষ্যত্ব, পাশ কাটিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা, তাতে নিস্তার পাওয়া যায় না।"

লোকটা যে ঠিক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিল, তা আর জানবার উপায় নেই। তবে তার পরিচয়টা জানা থাকলে একটা আন্দাজ হয়ত করা যেতে পারে।

তার সম্পর্কে এইটুকু মাত্র জানা গিয়েছে, যে-গাড়িটায় চড়ে সে রাত্রিতে বাড়ি ফিরছিল, লোকটা তার মালিক নয়, ওটা

তার অফিসের গাড়ি। অফিসে আঠারো বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বছরখানেক আগে যেটুকু পদমর্যাদা সে অর্জন করেছে তাতে অফিসের গাড়ি সে ব্যবহার করতে পারে, তবে সব সময় নয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ তার যখনই শেষ হোক, রাত্রি এগারোটার আগে সে বাড়ি যাবার গাড়ি পাবার অধিকারী নয়। সে যে তার অনেক সহকর্মীর চেয়ে মর্যাদায় কিছুটা বড়, এটা দেখাবার জন্য সে অফিসের গাড়িতেই বাড়ি ফিরত। এবং এগারোটার আগে গাড়ি পাবে না বলে দশটার মধ্যে যে-কাজ অনায়াসে শেষ করতে পারত, সেটাকে রোজই রাত এগারোটা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত। অবিশ্যি জানা গিয়েছে যে ডিউটি আওয়ারের বাইরে কি ছুটির দিনে হঠাৎ কাজ পড়লে ম্যানেজার অফিস থেকে কোন কোন সময় গাড়ি পাঠিয়েও তাকে ডেকে আনত। গাড়ির হর্ন শুনে তার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো যখন উত্তেজনায় অধীর হয়ে তার দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে “বাবা বাবা, তোমার গাড়ি এসেছে” বলে ডাকত, তখন “তোমার গাড়ি” কথাটা শুনতে তার কিন্তু খুব খারাপ লাগত না। সে আড়চোখে স্ত্রীর দিকে একবারটি উঁচু নজরে চেয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে পোষাক পরতে শুরু করত। কারণ গাড়িটা কতক্ষণ দুয়ারে দাঁড় করিয়ে রাখার রাইট্ তার আছে, সে জানত না। গাড়িটাকেই তার যেন কেমন মনিব বলে মনে হত। ড্রাইভারকে সে যেন কেমন সমীহ করে চলত। মাঝে মাঝে বড় মেয়েটা তাকে অপ্রস্তুত করত, “বাবা, তোমার গাড়িতে আমাকে একদিন চড়াবে।” সেদিন কেন জানিনে সে আর স্ত্রীর দিকে গজদন্তমিনারি নজরে চাইতে পারত না।

কোন রকমে "আচ্ছা আচ্ছা, একদিন চড়াব" বলে চটপট গিয়ে গাড়িতে উঠত। মেয়েটাকে একটা চক্কর দিয়ে ঘুরিয়ে আনবার জন্য খুব ইচ্ছে হত। কিন্তু তার যা স্ট্যাটাস তাতে সেই অধিকার আছে কি না সেটা তার জানা ছিল না। ভেবেছিল, একদিন কাউকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে। কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে আর বলতেই পারেনি। আবার গ্লানিটা মুছে ফেলতেও পারেনি।

এর দ্বারা বোঝা গেল পাড়ার এবং অফিসের লোকেরা তার চাল-চলন দেখে যতটা তালেবর তাকে মনে করত ততটা সে ছিল না। আসলে সে ছিল ভিড়েরই মানুষ, সাধারণ গড়ন, সাধারণ ওজন, উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন চার ইঞ্চির বেশি নয়।

খোঁজ নিলে তার স্কুলের বা কলেজের রেকরডে দেখা যাবে, সে কোন আদর্শ সৃষ্টি করে যায়নি। না পড়াশুনোয় না খেলা-ধূলোয়। এমন কি দুষ্টুমি বদমায়েসিতেও নয়। তার ক্লাশ-টীচারকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভুরু কুঁচকে হয়ত বলবেন, "হাঁ, হ্যাঁ, এ রকম একটা ছেলে ছিল বটে, তবে চেহারাটা ঠিক মনে পড়ছে না। বছর বছর কত ছেলেই তো আসে যায়, সকলের মুখ কি আর মনে থাকে?" এমনকি তার ইয়ারের সেন্ট-আপ ক্যানডিডেটদের যে গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল, তার ভিতর থেকেও তাকে বেছে বার করা সহজ ছিল না।

তবে স্বল্পস্থায়ী কলেজ জীবনে উঁকি মারলে এমন এক-আধটা ঘটনা হয়ত পাওয়া যেত যেগুলোকে ওর চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়ানো যায় না। যথা লোকটা একবার ডামবেল নিয়ে

অত মেতে উঠেছিল কেন? শহরের লাইব্রেরির পুরানো রেজিসটারিতে ওর নামে যে-সব বই-এ দুর্ধর্ষ লোকদের কাহিনী বা নিদারুণ সব শক্তি সাহসের উল্লেখ আছে, সে-গুলোই বা নিয়মিত ইস্যু করা হয়েছিল কেন? আর কেনই বা মাস কতক আদা ছোলা খেয়ে পাড়ার বজরঙ্গবলীর আখড়ায় যুযুৎসু শিখতে গিয়ে কণ্ঠার পলকা হাড়টা ভেঙে দু-সপ্তাহ হাসপাতালে শয্যা নিয়েছিল?

এমন হতে পারে যে, সেই সময় দেশে শক্তিচর্চার ফ্যাসানের একটা জোয়ার এসেছিল আর লোকটা তারই জোয়ারে আর পাঁচজনের মত গা ঢেলে দিয়েছিল। কিন্তু তদন্ত করলে ও যুক্তিটা না টিকবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ দেখা গিয়েছে, তৎকালে সেই শহরের তরুণদের চলতি ফ্যাসান শক্তিচর্চা ছিল না, বরং রেওয়াজ ছিল বড়ুয়া-কাফ্ জামা আর ফেরতা দিয়ে ধুতি পরে এক হাতে হ্যানডেল ধরে 'যে লগনে জনম আমার আকাশে চাঁদ ছিল রে' গাইতে গাইতে তীব্রগতিতে সাইকেল চালানোর।

তবে কি এটা নিছক একটা খামখেয়াল? হয়ত তাই। অবিশ্যি এও হতে পারে যে, কোনও কারণে তার উপর কোনও প্রবল পক্ষের আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল এবং আত্ম-রক্ষার্থে নিজেকে সে গড়ে পিটে তৈরি করছিল। জানা গিয়েছে, সেই সময় শহরে কিছু ষণ্ডা মার্কা বখাটে ছেলের উৎপাত বেড়েছিল। তাদের অত্যাচারে বাড়ন্ত মেয়েদের ঘাটে চান,

ইসকুল, কলেজ, সিনেমায় যাওয়া, পূজোর ভিড়ে বেরুনো প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তার নিজের বাড়িতে গুণ্ডাদের হাতে নিগৃহীত হবার মত কোন মেয়ে ছিল না বলে, এ-নিয়ে এতদিন মাথা ঘামায়নি। অবলা-বান্ধবরূপে কোনদিন আত্মপ্রকাশ করবে, এমন বাসনা তার হয়েছিল কি না, সে খবর কেউ দিতে পারেনি। বরং এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা এই সময়ে তার জীবনে ঘটেছিল বলে কানাঘুষা শোনা যায়, যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মেয়েদের নাম শুনলেই তার অধমাঙ্গ ঝিম মেরে হিম হয়ে পড়ত।

ঘটনাচক্রে সে একটা ভালো টিউশনি পেয়েছিল এবং তার আর্থিক অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে এই ছেলে পড়াবার কাজটা পেয়ে সে বর্তে গিয়েছিল। বেশ ছিল। হঠাৎ রাসের মেলা দেখার জন্য দিল্লি থেকে তার ছাত্রের পিসি অনেকদিন পরে তাঁর ভাই-এর বাড়িতে বেড়াতে এলেন। সঙ্গে নিজের দুই আর দেওরের দুই, এক সঙ্গে চার-চারটে মেয়েকে নিয়ে। একেই বাইরের মেয়ে, দিল্লির, ভালো সরকারি অফিসারের, তার উপর চারজনই রগরগে। পিসির মেয়ে দুটো ফ্রক ছেড়ে শাড়িতে তখনও ধাতস্থ নয়, তবু শাড়িই পরে, দেওরের টাট্টু মেয়ে দুটো শাড়িতে অভ্যস্থ নয়, সালোয়ার কামিজের কড়া শাসনে কোনমতে তারা দুটো রোখা শরীরকে বাগ মানিয়ে রেখেছে। ইংরাজিতে একেই বোধ হয় 'টেক্-অফ্-স্টেজ' বলে।

আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না, মফস্বলের উপোসী এক তরুণ প্রাইভেট মাস্টারের স্থির আর একঘেয়ে জীবনে এই চারটে

বেগবতী প্রাণের সান্নিধ্য কি প্রচণ্ড বিপর্যয়েরই না সৃষ্টি করে তুলেছিল।

প্রথম দিকে সে সম্ভবত হকচকিয়ে গিয়েছিল এবং তাই নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিল। যে জিনিসটি তাকে প্রথমেই বিচলিত করে তুলল, তা হচ্ছে প্রসাধনের গন্ধ। যে-ঘরে বসে সে ছাত্র পড়াতো তার সামনে দিয়েই স্নান ঘরে যাওয়ার পথ। স্নান করতে যাওয়ার সময় এবং স্নান সেরে ফেরার পথে মেয়েগুলো তাদের শরীরের গন্ধ মুঠো মুঠো ছড়াতে ছড়াতে যেত। এই সব তার নাসারন্ধ্রে উত্তেজনার সৃষ্টি করত। ক্রমে এই উত্তেজনা তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তার চিত্ত অস্থির হয়ে উঠল। প্রথম দিকে সে তার এই ভাবান্তরকে ভাল চোখে দেখেনি। ভেবেছিল তফাৎ থাকলে এ রোগ বোধ হয় সেরে যাবে। এ বাড়িতে পড়ে থাকার এত ইচ্ছেটা ভাল নয়। তাই একদিন পড়াতে এল না। দুদিন এল না, তিন দিন এল না। জোর করে নিঃসঙ্গ ঘরে সে নিজেকে বেঁধে রাখল। কিন্তু সেইদিন থেকে তার অস্বস্তি শতগুণ বেড়ে গেল। নিজেকে বাড়িতে আর কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারল না। চতুর্থ দিন ভোর না হতেই চুম্বকের প্রবল টানে সে ছাত্রের বাড়িতে এসে হাজির হল। বাড়ির গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন 'ক'দিন এলে না যে।' মুখ নিচু করে সে জবাব দিল 'শরীরটা ভাল ছিল না।' গিন্নীর স্বরে উদ্বেগ দেখা দিল। 'দেখো বাবা এ-ক'টা দিন সাবধানে থেকো। ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়ে বসো না। ছেলেটার টারমিন্যাল পরীক্ষা এসে গেছে। তুমি থাকলে তবু যা পড়তে বসে।' একটু হেসে, স্বর একটু নিচু করে বললেন,

'এমনি আর পড়বে কখন, বাড়িতে এখন তো অষ্টপ্রহর হইচই।'

ছাত্রকে নিয়ে সে অনেক কষ্টে মনঃসংযোগ করে পড়াতে বসল। ধীরে ধীরে গণিতের জটিলতার মধ্যে ডুব দিয়ে দিয়ে ক্রমে আত্মস্থ হয়ে উঠতে লাগল। তার ভাল লাগছিল, খুব ভাল লাগছিল। বেশ খানিকটা সময় সুন্দর কেটে গেল। এমন সময় তার নাকে আবার সেই পরিচিত শরীরের গন্ধটা প্রবেশ করল। মুহূর্তের মধ্যে রাশি রাশি অস্থিরতা তার কায়মনে হুল ফোটাতে শুরু করল। অন্যদিনের মত গন্ধটা কিন্তু বারান্দা দিয়ে বাথরুমে চলে গেল না। ঘরের মধ্যে বেশ নিবিড় হয়ে জমে এল। সে কোনদিকে চাইল না। বই-এর পাতায় জোর করে চোখ ডুবিয়ে বসে থাকল। ধ্বক ধ্বক ধ্বক তার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হল, অস্থির শরীরটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইল।

'আর পোজ মারতে হবে না, একবার মুখটা তুলুন।'

ধরা পড়ে বোকার মত মুখ লাল করে সে ভয়ে ভয়ে চোখ তুলল। পিসির দেওরের বড় মেয়েটা। কাছে, একেবারে কাছে। মিচকে মিচকে হাসছে।

"আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো ঘরে যে আমি এসেছি, টের পাননি আপনি?"

গোলগাল সতেজ একখানা মুখ, সে চেয়ে দেখল, তার চোখের উপর ভাসছে। কপাল, ভুরু, চোখ, নাক সব যেন পালিশ করা। মুখখানায় আবার দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল, চোখ দুটো চিক চিক করতে থাকল।

"কী, আপনি টের পাননি? ওসব চাল অনেক দেখেছি। যাক গে শুনুন, আমার সাবান ফুরিয়ে গিয়েছে, চান করতে পারছিনে। চট করে একটা পিয়ার্‌স্‌ এনে দিন না।"

এইভাবেই তার সঙ্গে এই মেয়েগুলোর আলাপ হয়েছিল। কারো সাবান, কারো স্নো, কারো ফিতে আনার সূত্র ধরে ধরে। তার মফস্বলী অস্তিত্বের কাছে ওরা ছিল অন্য গ্রহের জীব। এদের সংস্পর্শে এসেই তার দুটো জীবন শুরু হল। তার একটা জীবনে এদের সান্নিধ্যের উত্তেজনা। সে এদের সহচর, ভক্ত, ভৃত্য। এদের হুকুম তামিল করতে পেরে সে কৃতার্থ হত। সুখে ভাসত। আরেকটা জীবনে এদের জন্য তার যন্ত্রণা যন্ত্রণা যন্ত্রণা। কারণ সেই গোপন জীবনে এদের সঙ্গে তার সব ব্যবধান ঘুচে যেত। সে ভুলে যেত সে সাধারণ, সে ভিড়ের মানুষ, আলাদা করে তাকে বেছে নেবার মত কোন চিহ্ন তার নেই। তখন সে এদের সমপর্যায়ে উঠে আসত। মাঝে মাঝে এদের উপরেও সে উঠে যেত। তখন নিজেকে তার আরব্য কাহিনীর বাদশা বলে মনে হত। আর এরা তখন তার হারেমের বাঁদী। তার উড়ন্ত পালঙ্কের অধিকারে চারটি বাঁদীকে নিয়ে সে যথেচ্ছভাবে মনোসাধ পূরণ করে নিত। গাধার দুধ ঢেলে এরা তাকে চান করিয়ে দিত। চামর দিয়ে বাতাস করত। আঙ্গুরের থোকা থেকে টসটসে আঙ্গুর ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মুখে আলতো আলতো পুরে দিত। তারপর এক সময় বাদশাগিরি ফুরিয়ে গেলে সে অশেষ যন্ত্রণার সাগরে ডুবতে ডুবতে ছটফট করত।

একদিন পিসিমার দেওরের মেয়েটা আবার পড়ার ঘরে

এসে হানা দিল। সন্ধ্যার টিপে ওদের সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে। হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, "যান; টিকিট কিনে আমুন।"

টিকিট কিনতে যেতেই গুণ্ডাদের সরদারটা ওর কলার চেপে ধরলে, "শালা, একা একা মজা লুঠছ।" সে ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই গোটা দলটা জবরদস্তি তাকে অন্ধকার গলিতে ধরে নিয়ে গেল।

ওর মুখের সামনে ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, "বল, শালা ভাগ দিবি কি না?"

প্রথম দিকে সে ওদের কথার মানে বুঝতে পারেনি। এই অতর্কিত আক্রমণে ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। সে ঠকঠক করে কাঁপছিল। মুখ দিয়ে তার কথা বের হচ্ছিল না। গুণ্ডার সরদার তার মুখে ধাঁই করে এক ঘুঁষি মারতেই সে দেওয়ালের গায়ে ছিটকে পড়ল।

"মুখে যে কথা নেই রে। চার চারটেকে শালা একা শানটিং দিচ্ছ, আর, আর আমরা বসে বসে আঙুল চুষছি। ইয়ারকি। আবে—"

আবার তার বুকে, মুখে, পেটে সেই ষণ্ডাটা পরপর গোটাকতক ঘুঁষি ঝাড়ল। তারপর তার কলার ধরে তাকে শূন্যে তুলে আচ্ছা করে ঝাঁকাতে লাগল। তার দম আটকে এল। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—" কিন্তু ঘড়ঘড়ি ছাড়া কোনও আওয়াজ বের হল না। হঠাৎ সে এক সময় আছড়ে মাটিতে পড়ল। খাবি খেতে খেতে বাতাস টানতে

লাগল। আঃ বুকের যন্ত্রণা কিছুটা আরাম হল। নিঃশ্বাস টানতে এত ভাল লাগে, এই প্রথম সে জানল।

কাতরাতে কাতরাতে বলল, "আমাকে ছেড়ে দিন, দোহাই আপনার পায়ে পড়ি। ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তো কিছু করিনি।" সে টের পেল সে কাঁদছে। ভিখিরির মত ভিখ্ মাঙছে।

"লে, এইবার তো কথা ফুটেছে, এইবার বল কবে আমাদের হাতে ওগুলোকে তুলে দিবি?"

"আমি, আমি আপনাদের কথা বুঝতে পারছি না। আমাকে ছেড়ে দিন।"

ষণ্ডাটা খেঁকিয়ে উঠল। "বুঝতে পার না, ন্যাকা। আচ্ছা ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মজাকি বের করছি। এই শালাকে ধর তো চেপে।"

দুজনে ওকে সাপটে চেপে ধরতেই ষণ্ডাটা খপ করে তার কাপড়ের ভিতরে হাত চালিয়ে বেকায়দা জায়গাটায় একটা টান মারল। তার হাতে একটা ছুরি সেই অন্ধকারেও চিক চিক করে উঠল। তারপর ষণ্ডাটা ধারালো ছুরির ফলাটা গোড়া পেড়ে চেপে ধরে হিস হিস করে বলে উঠল "মারব এক চোপ।" সে শিউরে উঠল। জমাট একটা সচল ঠাণ্ডা ভয় ছুরির ফলার থেকে ধীরে ধীরে উঠে তার তলপেটের ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের মধ্যে শিরশির করে এগুতে লাগল। ধীরে, অতিধীরে। হিমপ্রবাহের মত প্রায়-গতিহীন সেই সচলতায় সে মৃত্যুর আতঙ্ক অনুভব করল। সে নড়তে চড়তে ভরসা পেল না, নিঃশ্বাস ফেলতেও না। তার নিতান্ত অসহায়

শরীরটার স্বতস্ফূর্ত থরথরানির সঙ্গে অবিরল ধারে শুধু ঘাম ঝরে পড়তে লাগল।

"বেশি পেঁয়াজি করলে" তার কানে আবার ষণ্ডাটার চাপা ধমকটা হিস হিস করে প্রবেশ করল, "শ্যামচাঁদটি চুপিয়ে তোর গলায় ঘণ্টা করে ঝুলিয়ে দেব। মজা লোটা জন্মের মত ঘুচে যাবে। ভাল চাস তো, ওই মেয়ে চারটেকে আমাদের সঙ্গে ভজিয়ে দে। আর কাউকে যদি নাও পারিস তো সালোয়ার পরা বড় মেয়েটাকেই এনে দে।"

এতক্ষণে এই অমানুষিক অত্যাচারের মানেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল। এমন অবস্থায় পড়লে, অর্থাৎ জননের চাবিকাঠিটি পরহস্তগত হয়ে সমূলে বিনষ্ট হবার উপক্রম হলে, ইতিহাসে যাঁরা কোনও না কোনওভাবে দাগ রেখে গিয়েছেন, সেই সব বিশিষ্ট অবতার, পরাক্রান্ত সম্রাট, দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা বা লোকহিতব্রতী মনীষীরা কী করতেন, জানা নেই। ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁদের মূল্যবান জীবনে এই সমস্যাটি ঠিক এমন প্রকটরূপে দেখা দেয়নি।

এ বিষয়ে কোনও নজির না থাকায় সে বুঝতে পারল না, তার এখন কী করা উচিত। ষণ্ডা লোকটার দুঃসাহসিক কুপ্রস্তাবটা শোনা মাত্র সে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে ওদের চরমতম সাজা দিয়ে বীর দর্পে সিনেমার টিকিট কিনে ক্ষত-বিক্ষত দেহে সেই সালোয়ার পরা বড় মেয়েটার কাছে গিয়ে বরমাল্য নেবার জন্য দাঁড়াতে পারত। কিন্তু তার গায়ে তেমন বল নেই, সে জানত। আর তাকে যেমন বেকায়দায় ওরা ধরে আছে, একটু এদিক ওদিক হলেই মূলোচ্ছেদ ঘটবার সমূহ আশঙ্কা। তাই

সে বীরত্বব্যঞ্জক কোনও ঝুঁকি নেবার কথা ভাবতে পারল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে শুধু থরথর করে কাঁপতে লাগল। আর গলগল ঘামতে লাগল। কিন্তু জিততে না হয় না পারত, মনের জোরে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে বীরের মৃত্যু তো বরণ করতে পারত। সত্যি বলতে কি, এই চিন্তা করার মত সাহসটুকুও তার সেই শাণিত ছুরির শীতল এবং হিংস্র সংস্পর্শে এসে উবে গিয়েছিল। মেরুদণ্ডে প্রবাহিত শিরশিরানি তাকে এই কথাই বার বার বলে দিল না-পুরুষ হবার বীভৎস আশংকার চেয়ে কাপুরুষতার গ্লানিও শ্রেয়। আর তাই সে সেদিন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই গুণ্ডাদের প্রস্তাবে সায় দিয়ে মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে এসেছিল। ঘটনাটি তার জীবনে উপশমহীন এক ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল।

গ্লানির বোঝা বয়ে বেঁচে থাকায় সার্থকতা কি? শুধু বেঁচে থাকব বলেই যে-কোনও মূল্যে প্রাণটি রাখা—এই কি জীবন? এই প্রশ্ন তাকে নিরন্তর তাড়া করে ফিরেছে। নিতান্ত সাধারণ মাপের মানুষ, তাই লোকটি এই প্রশ্নের উত্তর পায়নি। শুধু যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। পরবর্তী জীবনে সে একটা মজার কথা শুনেছিল। যুক্তিনিষ্ঠা নাকি মানুষের নীতিপরায়ণতার উৎস। মানুষ মূলত যুক্তিপরায়ণ সুতরাং নীতিনিষ্ঠ। এই তত্ত্বকে সে কোনদিন চ্যালেন্জ করেনি। শুনতে ভাল লাগে বলে বরদাস্ত করেছিল। তবে এরই সঙ্গে সে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি টীকা জুড়ে দিয়ে সূত্রটিকে সম্পূর্ণ

করেছিল। যথা ঃ যতক্ষণ মানুষের মূলে ছুরির সুতীক্ষ্ণ ফলাটি মারাত্মকভাবে উদ্যত হয়ে না থাকছে ততক্ষণই মানুষ "মূলত যুক্তিপরায়ণ সুতরাং নীতিনিষ্ঠ।" মূলে ছুরিকাঘাতের আশঙ্কা দেখা দেওয়ামাত্র মানুষের যুক্তিশীলতা সেটি বাঁচাবার তাগিদে নীতিবোধকে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। অথচ এর জন্য তার অনুশোচনার অন্ত থাকে না। দিন-রাত সে গ্লানির আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে।

যেমন এই লোকটা জ্বলেছিল। আর এই অশ্বত্থামা-জ্বলুনির হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে ছুটে বেড়িয়েছে। ত্রাণ সে পায়নি।

একটু খোঁজ নিলে জানা যেত সেদিন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়িতে ফিরে এসে সে অন্ধকারেই মুখ লুকিয়েছিল। নিরাপদ পরিবেশের শক্ত তক্তপোশে বসে তার আঘাতের আকস্মিকতা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। এতক্ষণ পরে তার নাকে, ঠোটে, দাঁতের গোড়ায় আর চোখে একটা বোবা বেদনার দপদপানি শুরু হল। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছিল। আর কোমরের কাছটায় খিচুনির চোটে সে অস্থির হয়ে উঠল। এতক্ষণে সে টের পেল তার প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেয়েছে। বার বার যখন বমির জন্য তার উদ্বেগ হতে লাগল, তখন সে আর এটাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারল না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে ধুঁকতে লাগল। আর মনে মনে এই মেয়েগুলোকে অভিসম্পাত

দিতে লাগল। বিড় বিড় করে বলতে লাগল, এই ডাইনীরাই আমার এই লাঞ্ছনার কারণ। ওরা যদি না আসত, ওদের সঙ্গে যদি কোনদিন দেখা না হত, আলাপ না হত, তা হলে আজ আর আমাকে এমন বিপদে পড়তে হত না। কেন যে ওরা মরতে এখানে এসেছিল। আসলে এই মেয়েগুলোই আমার শত্রু। হ্যাঁ, ওরাই। প্রচণ্ড রাগে তার শরীরটা কাঁপতে লাগল। একটা প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা তার নাভির কাছ থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠতে লাগল। শত্রু। এই শব্দটা বার বার তার মগজে গিয়ে ঠক ঠক করে ঘা মারতে লাগল। শত্রু, শত্রু, শত্রু। একটা কাঠঠোকরা যেন অনবরত ঠোকর মেরে চলেছে। শত্রু, শত্রু, শত্রু। কথাটা ঠক ঠক করে সে তার মগজে পুঁতে দিতে লাগল। বার বার সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করল, তার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যই মেয়ে ক'টা দিল্লি থেকে এই শহরে ছুটে এসেছে। ষণ্ডাটার সেই হিস হিস শাসানিও তার কানে বাজতে লাগল, "খবরদার, কথার খেলাপ করলে নিস্তার নেই।" না, কথার খেলাপ করতে যাব কোন্ দুঃখে। সেই অন্ধকারে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে সে খানিকটা আশ্বস্ত হল। কথার খেলাপ করব কেন? ওরা আমার কে? আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, শত্রু। শত্রু, শত্রু, শত্রু। ওদের জন্য আমার কিসের দায়? দেব, তোমাদের হাতেই ওদের তুলে দিয়ে আসব। যত ক'টিকে চাও। যাকে চাও। কিন্তু আমাকে আর মের না। আমাকে মের না। দোহাই, আমাকে তোমরা খুঁতো করো না। আমাকে রেহাই দাও। সে ভয়ে কাঁপতে লাগল আবার। সে পরিষ্কার বুঝতে পারল তার জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। না না,

মৃত্যু নয়, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। সে শিউরে উঠল। ঠাণ্ডা ছুরিটা কিছুতেই সে তলপেটের নিচ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। বিকলাঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকা আরও ভয়াবহ। এরপর কিছুক্ষণ আর লোকটার সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। তারপর কপালে একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া পেয়ে সে চমকে উঠল।

"বাঃ, বেশ তো, আমরা সেজে গুজে বসে আছি, আর আপনি এই অন্ধকারে লুকিয়ে আছেন? টিকিট কই?"

আলো জ্বলতেই সালোয়ার পরা বড় মেয়েটা চমকে উঠল। "ইস্, একী! এত রক্ত কেন?"

লোকটা খপ করে তার হাতটা চেপে ধরল। দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, "তোমার জন্য।"

মেয়েটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমার জন্য! আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি আপনার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি না কি?"

লোকটা এরই মধ্যে বেশ ধূর্ত হয়ে উঠেছে। ভাবল মেয়েটাকে একবার যখন হাতের মুঠোয় পেয়েছি, তখন আর ছাড়া নয়। আজকেই ওদের হাতে তুলে দেব। এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। শুধু দেখতে হবে যেন পালিয়ে না যায়।

"সত্যি সাংঘাতিক লেগেছে আপনার। নাকে মুখে রক্ত চাপ বেঁধে আছে। দেখুন দেখুন, জামা কাপড় কেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দাঁড়ান একটু পরিষ্কার করে দিই। তুলো আছে? গরম জল? আইডিন?" মেয়েটা কিছু একটা করবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

"এ সব কোন কিছুই কাজে আসবে না। কিছুই আমাকে বাঁচাতে পারবে না।" লোকটা মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগল, কতবার তুমি গরম জল দিয়ে ধুয়ে দেবে? কতবার তুমি আইডিন লাগাবে? আমার রক্ত বন্ধ হবে না। ওরা আবার আমাকে ধরে ফেলবে। মারবে মারবে মারবে। খুঁতো করে দেবে। ওরা যে অনবরত ছুরি শানাচ্ছে। কী করে রক্ত বন্ধ হবে? এক তোমাকে যদি ওদের হাতে তুলে দিতে পারি, তবেই ওরা আমাকে রেহাই দিতে পারে।

"আবার পাগলামি করছেন। উঠবেন না, শুয়ে থাকুন। আমি বরং বাড়ি গিয়ে বড় কাউকে ডেকে আনি। আমার ভয় করছে।"

লোকটা বিছানায় উঠে বসতে না বসতেই মেয়েটা নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। ওই ছুতোয় পালিয়ে যাওয়ার তাল। পালাতে দেব না। সে বসে বসে দেখতে লাগল, মেয়েটা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথ পাচ্ছে না। সে এবার নিশ্চিন্ত হল। মনে মনে হাসতে লাগল।

মেয়েটি বার কয়েক ঘরময় ছুটে এক সময় মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ল। দুচোখে তার স্পষ্ট বিমূঢ়তা। দরজা জানালা-বিহীন, শুধু নিরেট দেওয়াল দিয়ে গাঁথা ঘর সে জীবনে কখনও দেখেনি। এমন ঘরে আর কখনও ঢোকেওনি। এই ঘরে অন্ধকারে ডুব দিয়ে মেয়েটি অনায়াসে ঢুকে পড়েছিল। কোন ফাঁক দিয়ে, এত আলোয় তা আর খুঁজে পেল না। মেয়েটি প্রথমে ভাবল এটা বোধ হয় ম্যাজিক। পরে ভাবল তার স্মৃতিবিভ্রম। প্রথমে অবাক হয়েছিল, পরে ক্রমশ ভয় পেতে লাগল। মেয়েটি

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন ভাবল। হাব-ভাব দেখে মনে হল, সহজে হাল ছেড়ে দেবে না বলে ঠিক করেছে। মেয়েটি একেবারে দেওয়ালের কাছে চলে গেল, তারপর দেওয়াল টিপে, ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে লাগল।

লোকটা এক মনে তক্তপোশে বসে বসে মেয়েটির কাজকর্ম লক্ষ্য করছিল। ওর জন্য সে দুঃখ বোধ করল। বেচারি কত চেষ্টাই না করছে! জানে না যে, সবই পণ্ডশ্রম। বিপদের মধ্যে ঢোকা সহজ, বের হওয়া শক্ত।

হঠাৎ মেয়েটি তার সামনে এসে রাগে ফেটে পড়ল। "কেন আমাকে আটকে রেখেছেন? কী মতলব? ছেড়ে দিন শিগ্‌গির।"

"আমি তোমাকে আটকে রাখিনি। আমরা আটকা পড়ে গিয়েছি।"

"ওসব চালাকি ছাড়। ভাল চাও তো দরজা এনে বসিয়ে দাও। নইলে পুলিশ ডাকব।"

"দরজা? এ ঘরে তো দরজা নেই।"

"ওসব বলে আমাকে ভোলাতে পারবে না। পাজি, বদমাস। আমি কচি খুকি নই। জান, আমার বাবা, জেঠা, সবাই বড় বড় সব জাঁদরেল সরকারি অফিসার। জান, এভাবে আমাকে আটকে রাখা বেআইন। পুলিশ ডাকতে পারি। তোমাকে জেলে দিতে পারি। ভাল চাও তো এক্ষুনি বাইরে যাবার দরজাটা বসিয়ে দাও।"

মেয়েটা তাকে ধমকাচ্ছে। তাতে সে ভয় পেল না। মেয়েটা তার কথা বিশ্বাস করছে না। তাই সে কষ্ট পেতে

লাগল। "সত্যি, বিশ্বাস কর, আমার কাছে এ ঘরের দরজা নেই। এসব ঘরে দরজা বোধ হয় থাকেই না।"

"দেখ, চালাকি করে আমার কাছে পার পাবে না। দরজা নেই তো তুমি এখানে ঢুকলে কী করে?"

"তুমি যেমন করে ঢুকেছ।"

"আমি!" হঠাৎ মেয়েটির সব রাগ জল হয়ে গেল। রীতিমত বিস্মিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কী করে এখানে ঢুকলাম বল তো?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "বলা মুশকিল। এইটুকু বলতে পারি, ঝামেলায় আমরা জড়িয়ে পড়ি, চাই নে, তবুও জড়িয়ে যাই। আর কিছু জানিনে।"

মেয়েটি তার ক্ষতবিক্ষত বিষণ্ণ মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তক্তপোশটাতে এসে বসল।

লোকটা করুণভাবে বলল, "আমি যা জানি তাই বলছি। বিশ্বাস কর।"

মেয়েটা এতক্ষণ পরে সহজভাবে হাসল, তারপর লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি খামাখা তোমাকে গাল দিয়েছি। হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কিনা। মেয়েদের অনেক সময় ভুলিয়ে এনে বদ মতলবে আটক করে রাখা হয় কিনা, তাই। দিল্লির ওদিকে তো প্রায়ই হয়। রোজই কাগজে পড়ি। একবার একটা মেয়েকে ভুলিয়ে এনে তার উপর অত্যাচার করে খুন করে ঘরে বন্ধ করে রেখে গিয়েছিল, জান। উঃ!" মেয়েটা শিউরে উঠে তার হাতটা চেপে ধরে বসে থাকল।

লোকটা হঠাৎ টের পেল, তার মগজে আর সেই

কাঠঠোকরাটা ঠক ঠক করে ঠোকর মারছে না। তাই তার সংকল্পটা শিথিল হয়ে আসছে। বিপদের গন্ধটা আবার ভুর ভুর করে উঠল। সে প্রাণপণে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল, না না, নরম হলে চলবে না। মুক্তিপণ না দিলে তার নিস্তার নেই। তারা ছেড়ে কথা কইবে না। মেয়েটার সঙ্গ তার আদৌ ভাল লাগছিল না। সে বেজায় বিরক্ত বোধ করতে লাগল।

"এমন ঘরে একা একা থাকলে ভয়ে এতক্ষণ আমি মরেই যেতাম।" মেয়েটা চুপ করতেই লোকটা ভাবল, টোপ ফেলছে না তো। বোধ হয় মতলবটা জেনে ফেলেছে। এখন পালাবার তালে তাকে মিষ্টি কথায় পালক বুলিয়ে চোমরাচ্ছে না তো? সে সতর্ক হল।

"এখন যদি নাও বেরোতে পারি তাতে আর তত ভয় নেই।"

আর থাকতে পারল না, লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, "ভরসাও বিশেষ নেই।"

মেয়েটা তার মুখে চোখ নাচিয়ে বলল, "তুমিই আমার ভরসা।"

লোকটা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, তারপর আর্তনাদ করে উঠল, "না না, আমি কারও ভরসা নই। আমার উপর নির্ভর করে লাভ হবে না। আমার কোন উপায় নেই। আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। বৃথা আমার উপর ভরসা রেখো না। হয় তুমি নয় আমি—ব্যাপারটা এখন এখানে ঝুলছে।"

লোকটাকে অমন ছটফট করতে দেখে মেয়েটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সে চেয়ে দেখল, লোকটার মুখ চোখ নাকের ক্ষতগুলো আবার তাজা হয়ে উঠেছে।

ব্যস্তভাবে মেয়েটি বলে উঠল, "ঘরে আইডিন আছে? আইডিন?"

লোকটা আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে পকেট থেকে রেফারির হুইসেল বের করে সমানে ফুঁকে যেতে লাগল ফ্রু্র্ র্ র্।

মেয়েটা তার মুখ থেকে হুইসেলটা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "কী পাগলামি হচ্ছে। বস চুপ করে। বেরুবার উপায় ভাব।"

লোকটা অসহায়ভাবে মেয়েটির নির্দেশ পালন করল। বলল, "হুইসেলটা ফেলে দিলে। এখন ওদের ডাকব কী দিয়ে? ওরা যদি শুনতে না পেয়ে থাকে তা হলে, হা ভগবান, আমার আর নিস্তার নেই। তোমার ধারণা নেই, ওরা কী নিষ্ঠুরভাবে আমাকে যন্ত্রণা দেবে।" ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল।

মেয়েটি তাকে শুশ্রূষা করতে করতে বলল, "কী হয়েছে বল তো? এমন অস্থির হয়ে উঠলে কেন? কাদের কথা বলছ? কাকে ডাকছিলে?"

লোকটা তখন ধীরে ধীরে সব কথা মেয়েটিকে খুলে বলল। বলল, "আমি জানি কাজটা ভাল নয়, উচিত নয়, তোমাকে পেলে ওরা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। তবু তোমাকে ওই গুণ্ডাদের হাতে তুলে না দিয়ে আমার আর কী উপায় আছে বল?"

মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। এই লোকটা যে এত ছোট, সেটা জেনে ঘৃণায় তার মনটা ঘিন ঘিন করে উঠল। ক্ষণকালের জন্যও তার প্রতি ওর মনে মমতা জেগেছিল, এটা ভাবতেও সে কষ্ট পাচ্ছিল। ওটা কি মানুষ! ছি ছি ছি। একই ঘরে একই তক্তপোশে বসে এতক্ষণ সময় কাটাবার জন্য তার শরীরটাকে অশুচি বলে মনে হতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে মেয়েটি বলল, "তুমি যে অম্লান বদনে কথাগুলো কী করে আমাকে বললে, বলতে পারলে, তাইতেই আমি অবাক হচ্ছি। তোমার জিভে আটকাল না? তুচ্ছ প্রাণটাই তোমার কাছে বড় হল, আমার সম্ভ্রমটা কিছু না? ছিঃ!"

লোকটা মনে মনে বলল, তোমার কাছে তোমার সম্ভ্রমটাই বড় হল, আমার প্রাণটা কিছু না? প্রাণটা কি তুচ্ছ করার জিনিস?

মেয়েটি : সম্ভ্রম গেলে মেয়েদের আর কী বাকি থাকে?

লোকটি (মনে মনে) : দেহটা থাকে, জীবনটা থাকে। প্রাণ গেলে মানুষের আর কী থাকে? পুরুষত্ব গেলে পুরুষের কী থাকে?

লোকটি বলল, "আমার সামনে আর কোনও উপায় ছিল না। বিশ্বাস কর, আমার আর কোনও পথ নেই।"

হঠাৎ ওরা চমকে উঠল। বাইরে থেকে শাবল দিয়ে গুণ্ডারা দেওয়াল খুঁড়তে শুরু করেছে। ভিতরে ওরা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকল। মেয়েটি ভাবল লোকটা কত নীচ! কী নিদারুণ স্বার্থপর! একটা মেয়ের মান রক্ষার জন্য প্রাণট।

ছাড়তে পারল না! অথচ আত্মত্যাগের কত বড় একটা দৃষ্টান্ত রাখতে পারত! লোকটা ভাবল, মেয়েটা শুধু নিজের স্বার্থটাই বড় করে দেখছে। একবারও বলল না, তোমার ভয় নেই। তোমাকে রক্ষার জন্য যে মূল্যই দিতে হোক দেব। তুমি শান্ত হও। স্বেচ্ছায় ওদের হাতে ধরা দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে একটা মহৎ দৃষ্টান্ত ও কী আর রাখতে পারত না? একদিকে দেওয়ালের ভিত নড়ে উঠতেই মেয়েটি আর স্থির থাকতে পারল না। ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদ কাঁদ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "পালাবার কী কোনও পথই নেই? এখনও সময় আছে। এখনও আমরা পালাতে পারি।"

হঠাৎ ছাদের দিকে নজর পড়তেই লোকটা একটা ঘুলঘুলি দেখতে পেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল তার উড়ন্ত পালঙ্কটা ছাদের উপর বাঁধা আছে। সে উৎসাহভরে বলে উঠল, "ওই ঘুলঘুলি দিয়ে ছাদে উঠতে পারলেই আর ভাবনা নেই। একবার উড়ন্ত পালঙ্কে চড়ে বসতে পারলে পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই আমাদের ধরে।"

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে না উঠতে আবার হতাশায় কালো হয়ে গেল। বলল, "অত উঁচুতে আমার হাত পৌঁছুবে না।"

লোকটা বলল, "আমার কাঁধে চড়ে উপরে উঠে যাও জলদি, ওরা ঢুকল বলে, উপরে উঠেই আমাকে টেনে তুলে নিও।"

দেওয়ালটা এখন খুবই নড়ছে। গুণ্ডাদের উল্লাসের ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। মেয়েটিকে অতি কষ্টে সে কাঁধে তুলে উপরে

উঠিয়ে দিল। আর মেয়েটি মুহূর্তে ঘুলঘুলি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা মেয়েটিকে তাড়া দিল, "আমাকে এবার টেনে তোল, আর সময় নেই।" মেয়েটির হাত আর এগিয়ে এল না। মেয়েটির নিরস কণ্ঠস্বর শুধু ঘুলঘুলি দিয়ে চুঁইয়ে এল, "তোমাকে ছুঁতেও আমার ঘৃণা হয়।" লোকটা চোখে অন্ধকার দেখল। হাত জোড় করে ভিক্ষে চাইতে লাগল, "আমাকে তোল, তুলে নাও। ওরা আমাকে পেলে আর আস্ত রাখবে না।" মেয়েটি জবাব দিল, "যার কোন মনুষ্যত্ব নেই তার মরাই ভাল।" লোকটা প্রাণের দায়ে লাফ ঝাঁপ করে কোনক্রমে এক হাতে ঘুলঘুলিটা ধরে ঝুলতে লাগল, গলা বাড়িয়ে দেখল, তার উড়ন্ত পালঙ্কে বসে মেয়েটা ইতিমধ্যেই নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। লোকটা আর একটা মাত্র প্রশ্ন মেয়েটাকে করল, "আমাকে যে ওদের মুখে ফেলে দিয়ে চলে গেলে, এর জন্য তোমার মনে অনুতাপ হচ্ছে না?" মেয়েটির ক্ষীণ উত্তর তার কানে ভেসে এল, "না, হচ্ছে না। তুমি কি মানুষ যে অনুতাপ হবে! তুমি যেমন অপদার্থ, রাক্ষসদের খাদ্য হিসেবেই তোমাকে শুধু মানায়।"

এক চাড় মেরে দেওয়ালটা ধসিয়ে দিতেই ঘরটা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। গুণ্ডাদের খল খল উল্লাস আর বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের মত অন্ধকার হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে যেটুকু আলো ছিল ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ঘুলঘুলিটা হারিয়ে যেতেই তার হাত ফসকে গেল। অন্ধকারের অতলে পড়তে পড়তে লোকটা মেয়েটিকে শুধু এই কথাটি জিজ্ঞাসা করেছিল, "আত্মত্যাগ কী একতরফা?" কোন উত্তর এল না। সম্ভবত আর একটা

কথাও সে বলেছিল, অথবা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অন্ধকারের অতলে ডুবে যাওয়ায় সে-কথাটি কারো কানে পৌঁছায়নি। বুড় বুড় করে ভেসে ওঠা কয়েকটি বুদ্‌বুদের মধ্যে সে তার এই আশাটাকেই ছেড়ে দিয়েছিল: আমি যদি তোমার মত হতে পারতাম। তারপর লোকটা সেই অন্ধকার স্রোতে গা এলিয়ে দিল।

২

তারপর বেশ কিছুকাল লোকটা মুখ লুকিয়েছিল। সম্ভবত এটা তার জীবনের "অন্ধকার যুগ"। এই সময়টা যে কীভাবে সে কাটিয়েছিল, কী ভেবেছিল, কী বলেছিল, তা অনেক চেষ্টাতেও জানা সম্ভব হয়নি। এরপর আবার যখন তার দেখা পাওয়া গেল তখন সে নগর পরিষদের বিরাট ভবনের একটা ছোট্ট ঘরে বসে টাইপ করছে। নগর পরিষদে যে-সব অধিবেশন হয়, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য সরকারি প্রতিবেদকের সহকারীর পদে সে বেশ কিছুকাল প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। যদিও সে অস্থায়ী তবু মাস গেলে বেতন পায় এবং মেসে একটি সিট সে সংগ্রহ করতে পেরেছে। আরও সান্ত্বনা তার ঘরখানায় মাত্র তিনটে তক্তপোশ। একটা তার, দ্বিতীয়টা এক তরুণ অধ্যাপকের, তৃতীয়টা খবরের কাগজের এক প্রৌঢ় রিপোরটারের। তরুণ অধ্যাপকের কোষ্ঠকাঠিন্য আর প্রৌঢ় রিপোরটারের অর্শ। প্রত্যহ বাথরুম খালি পেতে দেরি হওয়ার

এই কারণটি ছাড়া বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তার নালিশ জানাবার মত আর কিছু বোধ হয় ছিল না। এই ঘটনা তার জীবনে চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ বাথরুমে ঢোকার ছাড়পত্র পেতে পেতে ঘড়ির কাঁটা এমন একটা অস্বাভাবিক দূরত্ব সৃষ্টি করে বসত যে তার নাগাল ধরতে তাকে প্রাণপণে ছুটতে হত। ছুটতে ছুটতেই খাবার ঘরে ঢুকত, বাস ধরত, অফিসে তার চেয়ারে গিয়ে বসত। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চোখ বুঁজে হাঁফাত। তারপর শর্টহ্যানড খাতাটা খুলে পুরনো লজঝড় টাইপরাইটারের চাবিতে অনবরত ঘা মেরে চলত।

সিনিয়ার প্রতিবেদক পাশের চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে আরাম করে বিড়িতে সুখটান দিয়ে বলত, "চাকরি রাখা বড় সমস্যা হয়ে উঠল ভায়া। সেকরেটারি ব্যাটা যে-ভাবে পিছনে লেগেছে, রোজ ডেকে নিয়ে গিয়ে তড়পাচ্চে, মুখে ওই এক কপচানি, প্রোসিডিং আপ টু ডেট্ করুন। আরে বাবা, আমাদের কাজ তো আমরা তুলে দিচ্ছি। যা না, ছাপাখানায় গিয়ে গুঁতো মার না।"

এসব কথায় সে কান দিল না। বাতগ্রস্ত টাইপরাইটারের চাবি টিপে টিপে সে অক্ষরগুলোকে ঘাড় ধরে কাগজের উপর ঠেলে দিতে লাগল। বিঃ অঃ (বিশেষ অধিবেশন) পৃঃ ৩৭।

—আমাদের দাবি এই যে এ বিষয়ে কর্মচারীদের কথার উপর আস্থা রেখে হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে, প্রদেশপাল প্রদেশপাল···

সে ভাল করে নোটবুকটা দেখে নিল, সেখানেও

প্রদেশপাল। সিনিয়ারকে ডাকতে তন্দ্রাবিষ্ট ভদ্রলোক উঁ করে সাড়া দিলেন।

লোকটা : দাদা আপনার খাতাটা একটু দেখবেন?

সিনিয়ার (চোখ বুঁজে) আবার কী হল?

লোকটা : বিরোধী সদস্য মেয়রকে প্রদেশপাল বলেছেন যে।

সিনিয়ার (চোখ বুঁজে) : তবে কী বলবেন?

লোকটা : মেয়রের বাংলা তো বরাবর নগরপালই চলে আসছে। দেখুন না একবার খাতাটা।

সিনিয়ার (চোখ বুঁজে) : যা সব মাল, হরিদাস পাল বললেই বা ক্ষতি কী? যা হয় লিখে দাও।

লোকটা : তাহলে নগরপালই করি, কী বলেন?

সিনিয়ার (চোখ বুঁজে, জড়ানো জড়ানো স্বরে) : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঝামেলা মিটিয়ে দাও।

লোকটা আবার ঠক ঠক টাইপরাইটারের চাবি ঠুকে চলল···নগরপাল মহাশয়, আমাদের দাবি আপনার নেতৃত্বে একটা সর্বদলীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হোক। যে দুর্নীতি···

নাগরিক স্বার্থরক্ষা কমিটির নেতা : মিঃ মেয়র স্যর, পয়েন্ট অব অরডার, এর মধ্যে আবার দুর্নীতির কথা উঠছে কী করে?

বিরোধী ব্যাক বেনচার : খুব যে জ্বলুনি। আঁতে ঘা লাগছে বুঝি।

নাঃ স্বাঃ কমিটির ব্যাক বেনচার : চুপ করে বোস্।

বিরোধী ব্যাঃ বেঃ—স্যর, চোখ রাঙাচ্ছে।

বিরোধী দলের মুখ্য বক্তা : নগরপাল মহাশয়, দুর্নীতির নাম শোনামাত্র ওই দেখুন আপনার দলের সদস্যদের···

নাঃ স্বাঃ কমিটির নেতা : মেয়র স্যর, এই বিশেষ সভা ডাকা হয়েছে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। কার্যসূচিতে যা আছে, আলোচনা তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক। অবান্তর কথা শোনবার সময় নেই।

সংযুক্ত নাগরিক কমিটির সদস্য : স্যর, উনি আপনাকে ধমকাচ্ছেন। হাউসকে অবমাননা করা হয়েছে।

নাঃ স্বাঃ কমিটির সদস্যগণ (টেবিল থাপড়ে) : বসুন, বসুন, বাজে বকবেন না।

নগরপাল (টেবিলে হাতুড়ি ঠুকে) : অরডার, অরডার।

বিরোধী বক্তা (দাঁড়িয়ে উঠে) : স্যর, ওঁকে বসতে বলুন। আমি আমার কথা শেষ করতে চাই। এটা বাঁদরামোর জায়গা নয়।

নাঃ স্বাঃ কঃ সদস্যগণ (এক সঙ্গে) : শাট্ আপ, প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন।

মেয়র (বিপন্নভাবে) : চুপ করুন, বসুন, প্লী-ই-জ্।

নাঃ স্বাঃ কঃ সদস্যগণ : স্যর, ও বাঁদর বলেছে।

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ।

নাঃ স্বাঃ কমিটির নেতা (উঠে দাঁড়িয়ে) : মিঃ মেয়র স্যর!

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ। বসুন।

বিরোধী বক্তা : আপনি আমাকে ···

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ!

নির্দলীয় সদস্য : সভায় এভাবে গণ্ডগোল চলতে থাকলে···

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ!

সং নাঃ কমিটির সদস্যগণ (সমস্বরে) : শালারা চোর।

নাঃ স্বাঃ কঃ সদস্যগণ (তারস্বরে) : লাথি মেরে বের করে দিন স্যর।

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ। বসুন, বসুন।

সরকারি প্রতিনিধি : স্যর, এভাবে কাজ…

সং নাঃ কঃ : স্যর দেখুন, লাথি মারবে…

নাঃ স্বাঃ কঃ : স্যর, চোর বলে পার পেয়ে…

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ ··প্লী-ই-ই-জ্

সরকারি প্রতিনিধি : এভাবে কাজ চলা ··

নাঃ স্বাঃ কমিটির নেতা : স্যর, পয়েণ্ট অব অরডার…

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ প্লী…

বিরোধী বক্তা : স্যর, বৈধতার প্রশ্ন…

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ…সরকারি প্রতিনিধি : অসম্ভব…বিরোধী সদস্য : চোর চোর…মেয়র : প্লীজ প্লীজ…নাঃ স্বাঃ কমিটি : দালাল, চীনের স্পাই…বিরোধী পক্ষ : জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব…মেয়র : প্লীজ প্লীজ…সরকারি প্রতিনিধি : অসম্ভব স্যর, মুলতুবি করে দিন…

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : সভার কাজ মুলতুবি…

সকল পক্ষের সদস্য (সমস্বরে হৈ হৈ করে) : বাঁচালেন স্যর, বড্ড তাড়া আছে। আরেকদিন মিটিং ডাকুন। ব্যাপারটা জরুরি।

সমস্তটুকু টাইপ করতে বেলা গড়িয়ে গেল। সিনিয়ার প্রতিবেদক আগেই চলে গেছেন। তাঁর একটা পার্ট টাইম কাজ আছে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে, এমন সময় বেয়ারা

এসে লোকটাকে খবর দিল, সেকরেটারি ডাকছেন। সে কেমন যেন ভয় পেল।

ধীরে ধীরে সেকরেটারির ঘরে গিয়ে ঢুকতেই সে দেখল আজও সেই মহিলাটি এককোণে চুপটি করে বসে আছেন। সে একটু বিরক্ত হল। যেদিনই সেকরেটারির কাছে তার লাঞ্ছনা হয়, সেইদিনই এই মহিলাটি উপস্থিত থাকেন কেন? সাক্ষী নাকি?

সেকরেটারি খিঁচিয়ে উঠলেন, "প্রেগ্‌ন্যাণ্ট নাকি মশাই?" চকিতে চেয়ে দেখল, মহিলাটির মুখ তৎক্ষণাৎ লাল হয়ে উঠল। সেকরেটারি বললেন, "নড়তে চড়তে যে আঠাশ বচ্ছর, অ্যাঁ। গত জেনারেল মিটিং-এর প্রোসিডিংস হয়েছে?"

সে মাথা নেড়ে জানাল, না।

"কথা বলুন না", সেকরেটারি ধমক দিল, "ওসব ভারত-নাট্যম্ ভঙ্গীর কী বুঝব।"

সে জানাল, "এক্‌স্‌ট্রা অরডিনারি মিটিংটা শেষ হল এতক্ষণে। ওটাতে হাত দিইনি এখনও।"

"তো কখন আর দেবেন? আপনাদের নিয়ে আর পারা যাবে না।" সেকরেটারি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় নাগরিক স্বার্থরক্ষা কমিটির নেতা সংযুক্ত নাগরিক কমিটির নেতাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

সেকরেটারি লাফিয়ে উঠলেন। "আরে আসুন, আসুন, বসুন। ওরে চা নিয়ে আয়।"

তারপর রিভলবিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, "এই দেখুন আপনারা তো বিশ্বাস করেন না, শুধু বলেন, কাজ কেন

জমে থাকে। এই দেখুন আমাদের প্রতিবেদকদের কাজ। এখনও গত মিটিং-এর প্রোসিডিংস টাইপ হয়ে আসেনি। বলুন, কী করে কাজকর্ম করবেন। এর উপর আবার মাইনে বাড়াবার বায়নাক্কা।"

"তাই নাকি।" নাগরিক স্বার্থরক্ষা কমিটির নেতা অলসভাবে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বললেন, "খুবই অন্যায় কথা।" পানের রস লাগা দেশলাইয়ের কাঠিটা দাঁতের ফাঁক থেকে বের করে তিনি পুচ পুচ চুষতে লাগলেন।

বিরোধী সংযুক্ত নাগরিকদলের নেতা বললেন, "আর এর জন্য ট্যাক্স্-পেয়াররা আমাদের দোষ দেয়।" সেকরেটারির প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি তাগাদা দিলেন, "নাও দাদা, চটপট সেরে ফেল কাজটা, কমিটি মিটিং-এর সময় হয়ে গেল।"

নাগরিক স্বার্থরক্ষা কমিটির নেতা সেকরেটারিকে বললেন, "এর সেই ক্যানডিডেটের নামে অ্যাপয়েনটমেনট লেটার ইস্যু করে দিন। সামনের কমিটি মিটিং-এ ওই পোস্ট্ স্যাংশন করবার এজেনডা দিয়ে দিয়েছি। পাশ হয়ে যাবে।"

সেকরেটারি বললেন, "এ আর বেশি কথা কী। কালই দিয়ে দেব।"

ওরা দুজনে অপসৃত হতেই সেকরেটারির তেজ আবার ফিরে এল। "বাড়ি পালাবার তাল করছেন নাকি? যান, কাজটা তুলে ফেলুন।"

লোকটা আবার তার কুঠুরিতে ফিরে গেল। বেয়ারাকে

দিয়ে আনিয়ে এক কাপ চা খেল। তারপর টাইপরাইটারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চাবি টিপে টিপে ঠক ঠক করে অক্ষর সাজিয়ে চলল :

নাঃ স্বাঃ কমিটির নেতা : মাননীয় নগরপাল মহাশয়, আইটেম নম্বর বত্রিশ নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু স্যর গভীর লজ্জার কথা, আজ দেড় বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত যেভাবে টালবাহানা চলছে তাতে নগর পরিষদের সদস্য হিসাবে আমাদের সুনাম বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। স্যর, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের বিপক্ষীয় বন্ধুরাও জানেন, প্রতি বছর বিসূচিকার আক্রমণ আমাদের নাগরিক জীবনে কী ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনছে। গেল বছর কলেরা সন্দেহে মোট চার হাজার আটশ নিরানব্বুই জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল, তার মধ্যে দেড় হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। স্যর, তার আগের বছর এই রোগ সন্দেহে ভরতির সংখ্যা ছিল এক হাজার একশ বার, মৃত্যু সংখ্যা আটশ ছাপ্পান্ন। স্যর, এই সংখ্যা থেকেই আমার বক্তব্যের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। এইবারও স্যর, কলেরার সিজিন এসে পড়েছে। গত সপ্তাহে এই রোগ সন্দেহে সাতাশি জনকে ভরতি করা হয়েছে, তেইশ জনের মৃত্যু ঘটেছে। স্যর, (এবারে গলায় একটু আবেগ ঢেলে) মৃত্যু এসে যখন আমাদের কেশ স্পর্শ করেছে, তখনও যদি আমরা তার প্রতিকার করতে না পারি, তখনও যদি আমরা জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থ বড় করে দেখি, তাহলে···

"কী মশাই প্রেগন্যানট নাকি ?" এক মনে সে টাইপ-

রাইটারের চাবি ঠুকে যাচ্ছিল, হঠাৎ সেকরেটারির মন্তব্যটা তার মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে সেই মহিলাটির আরক্ত মুখখানা ভেসে উঠল। এতদিন সে মহিলাটিকে তার লাঞ্ছনার সাক্ষী হিসেবেই দেখে এসেছে। এখন তাকে অপ্রস্তুত হতে দেখে লোকটার ভালই লাগল। বেশ জব্দ হয়েছে। সে একটু আরাম বোধ করল। পরক্ষণেই প্রেগ্‌ন্যানট কথাটা, ওই মহিলার উপস্থিতি—সব মিলিয়ে তার মনে চনমনে একটা ক্ষিধের ভাব জাগিয়ে তুলল। তলপেটটা শিরশির করতে লাগল। সে অস্বস্তিটা ভুলে থাকবার জন্য যত্ন করে টাইপরাইটার ঠুকে চলল।

বিরোধী নেতা : মিঃ মেয়র স্যর, আমরা এখানে মেঠো বক্তৃতা শুনতে আসিনি। যদি কাজের কথা কিছু থাকে, মাননীয় সদস্যকে অল্প কথায় সেইটে বলতে বলুন।

নাঃ স্বাঃ কমিটির নেতা : স্যর, আমি আমার বক্তব্য রাখবার জন্য দাঁড়িয়েছি···

বিরোধী ব্যাক বেনচার : কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? বসে পড়ুন

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : অরডার, অরডার।

বিরোধী নেতা : মিঃ মেয়র স্যর···

মেয়র : আপনি বসুন, ওঁকে বলতে দিন।

বিরোধী নেতা : স্যর, আমার কথা···

মেয়র : প্লীজ, বসে পড়ুন।

বিরোধী নেতা : স্যর, আমা—

মেয়র : আমি আপনাকে অনুরোধ করছি

নাঃ স্বা কমিটির ব্যাক বেনচার (তারস্বরে) : স্যর, টু মেনটেইন দি ডিগনিটি অব্ দি হাউস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু এসটাব্লিশ ডেকোরাম অ্যান্ড টু প্রোটেক্ট্...

বিরোধী ব্যাক বেনচার (আরও চেঁচিয়ে) মিঃ মেয়র স্যর...

নির্দলীয় সদস্য : মাননীয় সভাপাল মহাশয়...

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : অর্ডার, অর্ডার। প্লীজ, প্লী-ই-জ...

বিরোধী ব্যাক বেনচার (তারস্বরে) : এটা কী পাগলা গারদ ?

নাঃ স্বাঃ কমিটির আরেকজন ব্যাক বেনচার : না, এটা ছাগলা হাট।

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ।

বিরোধী নেতা : মিঃ মেয়র স্যর, এভাবে কী করে কাজ চলবে। আপনি ওদের চুপ করতে বলুন। ওরা যদি এই রকম...

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ...

বিরোধী নেতা : গায়ের জোরে...

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, প্লীজ...

নাঃ স্বাঃ কমিটির নেতা : স্যর, ওরা গায়ের জোরে...

বিরোধী নেতা : তাহলে আমরাও...

মেয়র : প্লী-ই-জ্...

নাঃ স্বাঃ কঃ নেতা : স্যর, আমরা নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। গুণ্ডাবাজীর তোয়াক্কা...

বিরোধী ব্যাক বেনচার (চেঁচিয়ে) : পয়েন্ট অব প্রিভিলেজ স্যর, গুণ্ডা বলেছে ; আমরাও কারো তোয়াক্কা করি না, এটা কারো বাপের তালুক নয়।

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : আপনি বসুন।

নাঃ স্বাঃ কঃ নেতা : স্যর, বাপ তুললে।

বিরোধী ব্যাক বেনচার : স্যর, পয়েন্ট অব্ প্রিভিলেজ।

নাঃ স্বাঃ কঃ সদস্যরা : বাপ তুলেছে স্যর, পয়েন্ট অব বাঁদরের লেজ।

বিরোধী সদস্যরা (টেবিল থাপড়িয়ে) : স্যর, বাঁদর বলেছে, বাঁদর বলেছে স্যর, প্রত্যাহার করতে বলুন।

নাঃ স্বাঃ কঃ সদস্যরা : বাপ তুলেছে স্যর, বাপ তুলেছে, কনটেম্প্ট্ অব হাউস।

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : চুপ করুন, প্লীজ।

বিরোধী সদস্যরা : স্যর, বাঁদর বলেছে, উইথড্র উইথড্র।

নাঃ স্বাঃ কঃ ব্যাক বেনচার : স্যর, টু মেনটেইন দি ডিগনিটি অব দি হাউস···

মেয়র (হাতুড়ি ঠুকে) : প্লীজ, চুপ করুন প্লীজ।

বিরোধী সদস্যরা (টেবিল বাজিয়ে) : উইথড্র উইথড্র।

নাঃ স্বাঃ কঃ ব্যাক বেনচার : অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু এসটাব্লিশ ডেকোরাম

বিরোধী সদস্যরা : উইথড্র উইথড্র।

মেয়র : প্লীজ প্লীজ।

নাঃ স্বাঃ কঃ ব্যাক বেনচার : টু এসটাব্লিশ ডেকোরাম···

মেয়র : প্লীজ প্লীজ।

—অ্যানড···উইথড্র উইথড্র···টু প্রোটেক্ট্···প্লীজ প্লীজ··· দি রাইটস···উইথ ড্র···অ্যানড···প্লী-ই-জ···দি প্রিভিলেজেস ···উইথড্র ···অব দি···প্লীজ প্লীজ···মেমবারস···উইথড্র···

নাঃ স্বাঃ কমিটির কয়েকজন সদস্য (এক সঙ্গে) ঃ বল হরি হরি বোল।

মেয়র ঃ দি মিটিং অ্যাডজোরনস্ টিল···

—বল হরি হরিবোল

—ইনকিলাব জিন্দাবাদ

কপালের ঘাম মুছে কাগজগুলো গুছিয়ে সে বেয়ারাটাকে ডেকে বলল, "সেকরেটারি সাহেবের ঘরে রেখে আয়।"

—"সাহেব তো কখন চলে গেছেন বাবু।"

—"তা যাক, তুই টেবিলের উপর এমন জায়গায় রেখে দিবি যে কাল এসে চেয়ারে বসা মাত্র তাঁর নজরে পড়ে।"

পথে নামতেই সে টের পেল, বেশ সন্ধ্যে হয়েছে। খুব ক্লান্ত তবু মেসে ফিরল না। ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। সাজগোজ করা মেয়ে দেখল। বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড়-চেপ্টা আঁচল-খসা মেয়ে দেখল। ভিড়-পাতলা মনুমেণ্টের চাতালে গিয়ে বসল। কয়েক ভাঁড় চা খেল। একটা নোংরা মেয়ে, বছর দশ এগার বয়েস, আবছা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আকাশে অনেক তারা জ্বল জ্বল করছে। মানুষ কী কখনও তারায় তারায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। মেয়েটা ঘাসের উপরে বসে পড়ল। হিস হিস করে ট্রাম গেল। একটা মোটা-সোটা মানুষ আতরের গন্ধ ছড়িয়ে চাতালটার এক পাশে এসে বসল। একটা ছেলে আর মেয়ে গল্প করতে করতে চলে গেল। রাস্তায়

গোলমাল, মোটরের হর্‌ন্ শোনা গেল। তেল-মালিশ এসে তার পাশে বসল। ফিস ফিস করে বলল, "ভালো আছে বাবু।" সে বুঝল। ভয় পেল। ভাব দেখাল, খুব গভীর চিন্তায় মগ্ন, ঢাক ঢোল পিটলেও তার কানে কথা ঢুকবে না। "ভালো আছে বাবু, তাজা মাল।" তেল-মালিশ আবার ফিসফিস করল। তার ভয়টা বেড়ে গেল। তেল-মালিশ উঠে গিয়ে মোটা বাবুর কাছে বসল। সে দেখল, দুজনে ঘাড় নেড়ে কথা হচ্ছে। তেল-মালিশ উঠে পড়ল। মোটা বাবু আবার তাকে ডাকল। আবার দুজনে খানিকক্ষণ ঘাড় মাথা নেড়ে কথা হল। তেল-মালিশ উঠে মেয়েটার কাছে গেল। দুজনে ফিসফিস কথা হল। মেয়েটার হাসির আওয়াজ শোনা গেল। দুজনে উঠে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করল। মোটাবাবু আতরের গন্ধ ছড়িয়ে উঠল। দুটো ছায়া আগে গেল, একটা ছায়া পিছনে। ক্রমে সামনের দুটো ছায়া পিছনের ছায়াটায় ঢাকা পড়ে গেল। একবার ভাবল, সে-ও যাবে। ওরা কোথায় গেল, দেখবে। হঠাৎ সে টের পেল তার তলপেটের নিচটা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে। শিরশির করে একটা শীতল স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে মগজের দিকে ঠেলে উঠছে। ভয় পেয়ে বসে থাকল। একটু পরেই তেল-মালিশ ফিরে এল। সে লক্ষ্য করল, তেল-মালিশ তাকে আর আদৌ আমল দিচ্ছে না এখন। ঘুরে ঘুরে চাপা স্বরে হাঁকতে লাগল, "তে-ল-ম্লা-ই-স।"

হঠাৎ তার সেকরেটারি সাহেবের কথা মনে পড়ল। খামাখা লোকটা তার উপর ডাঁট ঝাড়ে। এমন ভাব দেখাল যেন, আজকের মধ্যে মিটিং-এর রিপোর্ট টাইপ করে না ফেললে

পৃথিবী রসাতলে যাবে। ঝুটমুট রাত করিয়ে দিলে। আসলে এক্‌স্‌টেনশনের সময় এসেছে তো, তাই নগর সভাসদদের এই সব কাজ দেখিয়ে তেল মাখছে। তে-ল মা-ই-স। বেশ ক্ষিধে পেয়েছে। সে মেসের পথ ধরল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত প্রচণ্ড অস্বস্তিতে মেসের বিছানায় তাকে ছটফট করতে হয়েছিল। কিন্তু ঘুম আসবার সঙ্গে সঙ্গে ময়দানের সেই নোংরা মেয়েটাই অনেক বাড়ন্ত হয়ে আর অনেক আতরের গন্ধ মেখে তার বিছানায় উঠে এসেছিল। আর তাই তাকে চাদরের কলঙ্ক মুছতে সাত সকালে সাবান হাতে কলতলায় ছুটতে হয়েছিল। কিন্তু অত ভোরে উঠেও সে সেদিন অফিসে লেট বাঁচাতে পারেনি।

অফিসের ঘরে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে উদরস্থ করে সে মনে মনে ঠিক করল, কিছু পয়সা জমাতে পারলে একদিন ও পাড়াটা ঘুরে আসবে। এমন সময় বেয়ারাটা এসে চমকে দিয়ে বললে, "বাবু, সাহেবের তলব।"

সেকরেটারির ঘরে ঢুকেই দেখে দুই নেতাও হাজির আছেন এবং ঘরের হাওয়া গরম। তাকে দেখেই সেকরেটারি খিঁচিয়ে উঠলেন। তার আগের দিন কষ্ট করে টাইপ করা কাগজগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এ সব কী করেছেন? এই কী প্রোসিডিংস্‌ না কি?"

সে বলল, "না স্যর, এটা সেদিনকার জেনারেল মিটিংএর রিপোরট। এর থেকে সিনিয়ারবাবু পুরো প্রোসিডিংস্‌ তৈরি করবেন। ওটা বরাবর উনিই করেন। আমি শুধু রিপোরটটা তৈরি করে রাখি।"

"আপনার মুণ্ডু করেন। এই না কী রিপোরট? কী সব ছাই ভস্ম টাইপ করে এনেছেন। অ্যাঁ!"

বিরোধী নেতা বললেন, "ভাগ্যিস আজ এসেছিলাম, তাই তো নজরে পড়ল।"

ক্ষমতাসীন দলের নেতা বললেন, "এ সব খিস্তি ফিস্তি দিয়েই কী এতদিন প্রোসিডিংগ্‌স্‌ তৈরি হয়েছে না কি?"

সেকরেটারি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমি থাকতে তা কী হতে দিই স্যর। কেমন সব লোক নিয়ে আমার কাজ সেটা আপনাদের দেখাবার জন্যই আজ রিপোরটটা আনিয়ে রেখেছিলাম।"

বিরোধী নেতা উঠতে উঠতে বললেন, "আর সেই ব্যাপারটা—"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সেকরেটারি বললেন, "ধরেই নিন, সেটা হয়ে গিয়েছে। ওর জন্য ভাববেন না।"

বিরোধী নেতা বেরিয়ে যেতেই দলীয় নেতা বললেন, "দেখুন, ও ব্যাপারটা—"

সেকরেটারি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "একবার যখন বলেছেন ওঁর ক্যানডিডেটকে নিতে, ধরে নিন নিয়েই নিয়েছি।"

দলীয় নেতা গলাটা নিচু করে বললেন, "চট করে কিছু করে বসবেন না, এখন বরং কিছুদিন ঝুলিয়েই রাখুন। এমনও তো হতে পারে যে ওর চাইতেও ভাল ক্যানডিডেট পাওয়া যেতে পারে। সত্যি বলতে কি, আমি একজনের কথা ভেবেই এসেছি। আরও বেশি উপযুক্ত। হাজার হোক, করদাতাদের টাকাই আমরা খরচ করছি। তাদের স্বার্থ কিসে

বজায় থাকবে সেইটেই আগে দেখা দরকার। ওই কথাটা বলতেই আসা। বুঝলেন?”

সেকরেটারি একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন। থতমত খেয়ে বললেন, “সে কি, আমি যে নিয়োগপত্রে সই করে পাঠিয়ে দিলাম।”

দলীয় নেতা বললেন, “অপজিশনকে তুষ্ট করবার জন্য আপনার তৎপরতা একটু বেশিই দেখি।”

“না না, কী যে বলেন”, সেকরেটারি হন্তদন্ত হয়ে বেল টিপলেন। বেয়ারা আসতেই বললেন, “চট করে ডেসপ্যাচে চলে যা। যে-সব চিঠি আজ সই করেছি, সব ফিরিয়ে নিয়ে আয়। একটাও যেন ডাকে না যায়।” বেয়ারা চলে যেতেই বললেন, “আপনি যেন ভুল বুঝবেন না। ওটা আমি গুড্ ফেতে আপনার অনুরোধেই করেছি, ওর ক্যানডিডেট বলে নয়। কাল যে-ভাবে আপনি বললেন। হেঁ-হেঁ। স্যর, আপনি হলেন পারটি ইন পাওয়ার। আপনার অনুরোধই আদেশ।”

নাগরিক স্বার্থরক্ষা কমিটির নেতা বেরিয়ে যেতেই সেকরেটারির মুখখানা দুর্ভাবনায় কিছুটা থমথমে হয়ে এল। আপন মনে টাকে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে নিলেন। বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, “শালা।” টেবিলের কাঁচে আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ তবলা বাজালেন। সে দেখল কত সহজে একটা দোর্দণ্ডপ্রতাপ লোক একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। অথচ ওঁরই দাপটে তারা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে। এতক্ষণ পরে হঠাৎ সেকরেটারি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি তো এখনও স্থায়ী হও নি, না?”

সেকরেটারি অন্তরঙ্গভাবে একেবারে "তুমি"তে নেমে আসায় সে বিস্মিত হল। বলল, "না স্যর। আমার কেসটা তো আপনার কাছেই পড়ে আছে।"

—"তোমার কেসটা আমার হাতে ঝুলছে বুঝি?" তাঁর কণ্ঠস্বর আরও মোলায়েম হয়ে এল।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যর।"

—"আমার কেসটাও ওঁদের হাতে ঝুলছে।" খুব সহজভাবে তিনি জানিয়ে দিলেন। "খুবই অনিশ্চিত।" একটু থামলেন। "যাও কাজ করোগে। এই সব রিপোরট নিয়ে যাও। আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে। ওঁদের মুখে যে-সব আনপারলামেনটারি কথা বসিয়েছো, সে সব কেটে বাদ দাও গে। ওঁরা খুব চটে গিয়েছেন।"

সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি কেন বসাতে যাব স্যর, ওঁরা যা বলেছেন, আমি তাই নোট নিয়েছি।"

—"তা বেশ করেছ, আমি সে ব্যাপারে তোমাকে চ্যালেন্‌জ্ করছি নে। এখন ওঁদের মুখের সেই সব কথা কেটে বাদ দিতে হবে। ওঁরা এ সব পছন্দ করছেন না। রিপোরট বদলে ফেল গে। তর্ক করো না। যাও, কাজ কর। উই হ্যাভ টু সারভ ডিমোক্রেসি।"

"কিন্তু স্যর", লোকটা বিপন্ন হয়ে বলল, "আমি কি করে রিপোরট বদলাব?"

সেকরেটারি খিঁচিয়ে উঠলেন, "ওঁরা জনপ্রতিনিধি, আমরা কর্মচারী। আমরা কৈফিয়ৎ দিতে পারি, চাইতে পারিনে। যাও।"

সেকরেটারির আদেশটা তার কাছে ভাল ঠেকেনি। এ আদেশের অর্থ অধিবেশনের বিবরণ খুশিমত বদলে ফেলা। এ কাজটা অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত বলেই তার মনে হল। প্রতিটি অধিবেশনে যা কিছু হয়, তাই সে লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য। এই তার চাকরি। সে তাই করেছে। সত্য বলতে কি, এতদিন লোকটা এত শত ভাবেও নি। যান্ত্রিকভাবেই তার কাজ সে করে গিয়েছে। আজ তার মনে হল, সত্যিই তো তার কাজ বেশ দায়িত্বপূর্ণ। তার বিবরণের হেরফেরে অধিবেশনের চিত্রটাই বদলে যেতে পারে। সম্পূর্ণ মিথ্যে ঘটনা সত্য বলে নথিভুক্ত হয়ে থাকতে পারে। অথচ সেকরেটারির মুখের উপর এসব কথা বলার সাহসও সে দেখাতে পারল না। তাই সে মনে মনে খুব গরম হয়ে গেল।

ঘরে গিয়েই সে দেখল সিনিয়ার এসে গিয়েছেন। সে তাকেই সাক্ষী মানল, "দেখুন তো দাদা, সাহেবের আবদার। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত টাইপরাইটার গুঁতিয়ে যে রিপোরট তৈরি করে রেখে গেলাম, এখন বললেন, সেটা বদলে দাও। পারটি নেতারা যে-সব আনপারলামেনটারি কথা বলেছেন, সে-সব বাদ দিয়ে দিতে হবে। আমরা কী তা পারি ?"

সিনিয়ার বললেন, "আইনত, ন্যায়ত আমরা তা পারিনে।"

সে সোৎসাহে বললে, "তবে! আরে পালটাতে হয়, আপনিই পালটে দিন না, ওসব বাজে ঝামেলা আমাদের ঘাড়ে চাপানো কেন ?"

সিনিয়ার বললেন, "অধিবেশনের বিবরণ উনিও পালটাতে পারেন না। ওঁর পক্ষেও সেটা বে-আইনি। তেমন বাধ্য

কোনও সভাসদের পাল্লায় পড়লে হুড়ো দিয়ে ছেড়ে দেবে।"

সে আরও উৎসাহ পেল। "তবে এ কাজ আমরা কী করে করি?"

সিনিয়ার উত্তর দিলেন না। সিনিয়ারের কথায় সে ভরসা পেল। বলল, "আমি এ কাজ করতে পারব না।"

সিনিয়ার বললেন, "কাল যদি জানতে চায়, কাজটা হয়েছে কি না, কী জবাব দেবে?"

সে একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল। জবাব? সে চট করে কিছু খুঁজে পেল না।

সেই কথাটাই সে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। প্রাণপণে একটা জুতসই জবাব খুঁজছিল। তার চোখের উপর দিয়ে দীর্ঘ এক মিছিল চলেছে, নানা ধরনের দাবির আওয়াজ দিতে দিতে। সে অতগুলো লোককেও আবছা দেখছিল, তাদের দাবির গর্জন অস্পষ্ট ঢেউ-এর মত তার কানে এসে ঢুকছিল। মিছিল ট্রাফিক বন্ধ করে দেওয়ায় বেজায় ভিড় বেড়ে গেল। সে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল।

—"কী এত ভাবছেন?"

কানের পাশে কথাটা যেন ভেসে উঠল। "অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে লক্ষ্য করছি"—তার কেমন যেন মনে হল কথাটা কেউ তাকেই বলছে—"এমন ভাবনা যে সামনে লোক দাঁড়িয়ে থাকলেও নজর করেন না, বাব্ বাঃ।" সে একেবারে সামনেই

চাইল। আরে এ যে সেই সেকরেটারির ঘরে বসে থাকা সেই মহিলা। তাকে দেখে হাসছেন। সে একটু অপ্রস্তুত হল।

মহিলাটি বললেন, "অবাক হবারই কথা। ভাবছেন চেনা নেই, শোনা নেই একেবারে অন্তরঙ্গ সুরে কথা। তাই না।"

সে শুধু বলল, "না কিছুই ভাবিনি। অন্যমনস্ক ছিলাম কি না?"

মহিলাটি আবার হাসলেন, "ভাবলেও কিছু বলার ছিল না। দেখুন না, বাসে উঠব বলে সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। তা মিছিল আর শেষই হয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হল, চারপাশে এত লোক, অথচ আমি একেবারে একা। কেন যে মনে হল জানিনে। খুব খারাপ লাগছিল। চারদিকে চেয়ে দেখলাম কত লোক, এত লোক অথচ একটা পরিচিত মুখ কেউ নেই এই ভিড়ে। একটা কথা বলার কেউ নেই। খুব খারাপ লাগছিল। হঠাৎ দেখি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। তা এমনই গভীর চিন্তায় মগ্ন যে ভিড় ঠেলে যে পাশে এসে দাঁড়ালাম, তা চেয়েও দেখলেন না।"

সে অপ্রস্তুতভাবে হাসল। "সত্যিই দেখতে পাইনি।" প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনিও বুঝি নগর পরিষদে কাজ করেন?"

"হ্যাঁ, স্কুল টীচার। হেডমিসট্রেসের কাজ করিয়ে নিচ্ছে বছরের পর বছর, অথচ কনফারম্ করছে না। কী অন্যায় বলুন তো। সেকরেটারি সাহেবের ঘরে ধর্না দিতে দিতে তো জুতো ছিঁড়ে গেল।"

প্রেগন্যানট নাকি মশাই—সেকরেটারির মন্তব্যটা মনে

বাজতে এবার সে নিজেই একটু লজ্জা পেল। সাহেবের মাত্রাজ্ঞান একটু কম। ভদ্রমহিলাকে অকস্মাৎ তার খুব ভাল লেগে গেল।

হঠাৎ দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই সে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল প্রচণ্ড বৃষ্টি আসছে। সে বলে উঠল, "চট করে কোথাও আশ্রয় নিই চলুন, নইলে ভিজে মরতে হবে।"

মেয়েটি আকাশের দিকে চেয়ে বলল, "চলুন তবে, পাশের ওই রেস্তোরাঁটায় গিয়ে বসি। পা ব্যথা করছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।"

সে একটু ইতস্তত করে রাজি হল। দ্বিধার কারণ তার পকেটের সঙ্গীণ অবস্থা। কোনও মেয়ের সঙ্গে তার রেস্তোরাঁয় ঢোকা এই প্রথম। এবং নিতান্তই আকস্মিক। শেষরক্ষা কীভাবে করবে, সে বিষয়ে বিলক্ষণ ভাবিত হল।

ওরা ঢুকতে না ঢুকতেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। কোনমতে এক কোণে গিয়ে ওরা দাঁড়াতে পারল মাত্র, বসবার জায়গা পেল না। মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে মজা করে হাসল। বৃষ্টি পড়া শুরু হতেই হুড়মুড় করে আরও লোক ঢুকে পড়ল ভিতরে। লোকের চাপে ওদের দুজনের মাঝখানে আর ব্যবধান রইল না। ওরা গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিভিন্ন লোকের ফিসফাস কথায় ঘরের ভিতরটায় একটা অদ্ভুত ধরনের গুঞ্জন চলছিল। বাইরে বৃষ্টি, মোটরের হর্‌ন্ আর থেকে থেকে ট্রামের হিস হিস গর্জন। লোকটা কথা বলছে না দেখে মেয়েটা ভাবল বিরক্ত বোধ করছে না তো। কিন্তু

সান্নিধ্যে তো বিরক্তির আভাস নেই। লোকটা প্রথমেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, যাক বসতে যখন পায়নি তখন পয়সা খরচের আশঙ্কা বিশেষ নেই। এই ভিড়ে বসার জায়গাই মিলবে যে কজনের, কে জানে? পরক্ষণেই সে লজ্জা পেল, বসবার জন্যই এসেছিল মেয়েটা। "বসতে পারবেন বলে মনে হয় না", গলাটা নামিয়ে সে বলল। "তাই তো দেখছি", মেয়েটা ফিসফিস করল, "অন্য কোথাও যাব, তারও উপায় নেই।"

একটু পরে মেয়েটি আবার ফিসফিস করল, "আমার ভাগ্যটাই এমনি জানেন। যা চাই তাই ফস্কে যায়।" ম্লান হাসল। "ইস্কুলে এতদিন ধরে আমাকে দিয়ে প্রধান শিক্ষিকার কাজ করিয়ে নিলে, আমি ভাবতেই পারিনি এরা এইভাবে আমার দাবিটা উপেক্ষা করবে। আরও অপমান কী জানেন, আমারই একজন জুনিয়ারকে আমার উপরে বসাচ্ছে। তার ধরার লোক আছে। আমিও ছাড়ব না। ফাইট করব। মুখ বুঁজে এই অন্যায় মেনে নেওয়া উচিত নয়। উচিত কী, বলুন।"

আসলে অন্যায়গুলো আমরা নির্বিবাদে মেনে নিই বলেই অন্যায়ের এত বাড় বাড়ন্ত। কথাটা মনের মধ্যে বেশ তেড়ে ফুঁড়ে উঠল। পরক্ষণেই সে টের পেল কথাটা তার কানে কেমন লেকচার শোনাচ্ছে। তবু লোকটা ভাবল, মেয়েটার বেশ সাহস আছে তো। কেমন বলছে, ফাইট করব। কথাটা কত সহজে বলতে পারছে। সে-ই বা ফাইট করবে না কেন? ধরা যাক সে সাহেবের কাছে গিয়ে বলল, স্যর ভেবে দেখলাম, অধিবেশনের বিবরণে কারচুপি করা আমার দ্বারা হবে না।

একাজ অন্যায়, গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। সাহেব এর কী জবাব দেবে ?

মেয়েটা ওকে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, "চলুন, দুটো চেয়ার খালি হয়েছে, চট করে দখল করে ফেলি।"

ওরা দুজনে সত্যিই শেষ পর্যন্ত বসবার জায়গা পেল। সে একবার ভাবল আগেই জানিয়ে দেয়, তার ক্যাশ ব্যালান্স্ বিশেষ সুবিধের নয়। কিন্তু সামান্য পরিচয়ে একজন মহিলার সামনে তার দৈন্যের পরিচয় চট করে দেওয়া লজ্জায় বাধল। সে সন্তর্পণে পকেটের উপর হাত বুলিয়ে সেখানে মোট কত আছে, তার একটা হিসেব নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ঠিক বুঝতে পারছিল না, তাই উদ্বেগ বোধ করছিল।

"আঃ", মেয়েটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলল। "সত্যিই পা দুটো ধরে গিয়েছে। আমার কি মনে হচ্ছিল জানেন, মেঝের উপরই বসে পড়ি।"

খুব একটা কিছু নাও খেতে পারে। লোকটা ভাবল। কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে কি ? যদি ওজন না বুঝে একটা অরডার দিয়ে বসে তখন।

"আমার হাতে কিছু কিছু কাগজপত্র আছে জানেন ?"

এতক্ষণ পরে বয়কে আসতে দেখা গেল।

"তারপর, সব থেকে বড় প্রমাণ রয়েছে ইসকুলের রেজাল্ট।"

লোকটি বলে উঠল, "আমি কিন্তু চা খাব। শুধু এক কাপ চা। ব্যাস্।"

কথাটা বলে ফেলে একটু হালকা বোধ করল। প্রার্থনা করতে লাগল, ইংগিতটা যেন যথাস্থানে পৌঁছায়।

ভদ্রমহিলা থমকে গেলেন। আবেগের টানে আপন মনেই নিজের কথা বলে যাচ্ছিলেন। লোকটার কথা শুনে তার মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, “কিন্তু বলবেন কাকে ?”

সে দেখল বয়টা তাদের দিকে না এসে দূর থেকেই আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

লোকটা লজ্জা পেয়ে বলল, “হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন ?”

মেয়েটি বলল, “কী আর, দুর্ভাগ্যের কথা।”

তারপর তারা যতক্ষণ ছিল, ওই একটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছিল। এবং আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তেই এসেছিল, ভদ্রমহিলার ফাইট করাই উচিত।

সেদিন বৃষ্টিভেজা পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর অবধি ভদ্রমহিলাকে এগিয়ে দিয়ে সে মনে একটা রেশ নিয়ে মেসে ফিরে এসেছিল। যেতে যেতে নিজের সমস্যার কথাটাও সে বলে ফেলেছিল। ভদ্রমহিলা একবাক্যে রায় দিয়েছিলেন, ফাইট করুন। আর এই কথায়, কি আশ্চর্য, সে বুকে বেশ বল পেয়েছিল।

পরদিন আবার সেই রেস্তোরাঁয় দুজনের দেখা হয়েছিল, তারপর কারজন পারকে, একটা ছুটির দিনে বোটানিক্যাল গারডেনে। তারপর আরো অনেকদিন বিভিন্ন জায়গায়। প্রতিটি সাক্ষাৎ আরেকটি সাক্ষাৎকে ডেকে এনেছে। অন্যায়ের

বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের সংকল্প প্রতিদিন নতুন করে নিতে হয়েছে। তারপর ভদ্রমহিলাকে তার সেই অধস্তন এক শিক্ষিকার হাতে ইস্‌কুলের প্রধান শিক্ষিকার পদটি তুলে দিতে হয়েছে, কারণ শিক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সেকরেটারি তাকেই প্রধান শিক্ষিকার পদে নিয়োগ করেছেন। ভদ্রমহিলা ফাইট করতে চেয়েছিলেন, করেননি, ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন, পারেননি, সেই ইস্‌কুলেই সহকারী শিক্ষিকার চাকরি করে চলেছেন। খবর নিলে জানা যাবে, সেইদিন বিকালে তারা কেল্লার কাছে এক নিরিবিলি মাঠে গিয়ে বসেছিল। অপমানের জ্বালা ধুয়ে ফেলার জন্য সেদিন ভদ্রমহিলার অনেক চোখের জল ফেলবার দরকার হয়েছিল। লোকটা তাকে বিশেষ সান্ত্বনা দিতে পারেনি। শুধু তার পাশে চুপ করে বসে ছিল।

তারপর লোকটা যেদিন সেকরেটারির নির্দেশ মান্য করতে টাইপরাইটার নিয়ে বসেছিল, সেইদিন সিনিয়রকে প্রশ্ন করেছিল, "আচ্ছা, ব্যাপারটা কেউ যদি চ্যালেন্‌জ্‌ করে?"

সিনিয়র জবাব দিয়েছিলেন, "পারটি যদি ছুঁদে হয়, তাহলে আমাদেরই ফাঁসিয়ে দেবে।"

সে বোকার মত বলেছিল, "কিন্তু আমরা তো ইচ্ছে করে এ কাজ করছিনে, অন্যের হুকুমে করছি। আমাদের কী কোনও প্রোটেকশন নেই?"

"প্রোটেকশন!" সিনিয়র হাসলেন, "আমাদের কে দেবে?"

"বাঃ!" লোকটা সিনিয়রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ শুধু চেয়ে রইল। "কিন্তু আমরা তো উপরওয়ালার আদেশই মানছি, আমাদের অপরাধ কী?"

সিনিয়র একটু হাসলেন, "ভায়া, রিপোরটটা বদলাচ্ছে কে? তুমি না উপরওয়ালা? প্রমাণ হবে তুমিই বদলেছ, কাজেই অপরাধ তোমারই। উপরওয়ালা যে হুকুম দিয়েছেন, বিপদ দেখে তিনি তো তা অস্বীকার করবেন, তখন প্রমাণ করতে পারবে?"

হঠাৎ সে বলে উঠল, "যদি বলি লিখিত আদেশ ছাড়া এ কাজ করতে পারব না। আমাদের এভাবে বিপদে ফেলার কোনও অধিকার কারও নেই। এ দাবি আমাদের তোলা উচিত, নয় কী?"

সিনিয়র মুখে একটা পান পুরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "টোলা হয়টো উচিট।" কস থেকে রস গড়িয়ে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি তিনি উস্‌প করে তা টেনে নিলেন। হাতের তেলো দিয়ে মুখ মুছে বললেন, "কিনটু কে টুলবে?"

"আমরা। মানে আপনি, আমি?"

এভাবে বেঁধে মার খাওয়ার কোনও মানে হয় না। একবার, জীবনে একবার যদি প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে বলতে পারি, সে নিজেকেই বোঝাতে চেষ্টা করল, না, করব না, তাহলেই বোধহয় তার জ্বরটা চিরদিনের মত সেরে যায়। সে তাহলে মাথা তুলে হাঁটতে পারে। জ্বর? হ্যাঁ জ্বর। ভয় তো জ্বরই। এই বুড়োটা, সিনিয়রের দিকে চাইল, ক'দিনই বা আর বাঁচবে, তবু ভয় সারাতে পারল না। আচ্ছা, ওর এত ভয় কিসের? আর ছয় মাস পরে তো অবসর নেবেন, এখন তবে আর পরোয়া কি? বুক ফুলিয়ে সেকরেটারির ঘরে গিয়ে ঢুকতেই বা বাধা কোথায়? বজ্রনির্ঘোষে (কথাটা অনেকদিন আগে খবরের

কাগজের এক সম্পাদকীয়তে পড়ে রেখেছিল, মনে পড়ল) সেকরেটারিকে অনায়াসে বলে আসতে পারেন, না, এসব নীতিবিরুদ্ধ কাজ আমরা করতে পারব না। উনি তো আর অস্থায়ী নন, এক কথায় চাকরি যাবারও ভয় নেই। আর যদিও যায়, তত ক্ষতি নেই। মেয়াদ তো আর মোটে ছয় মাস। সে সিনিয়রের দিকে চাইল।

সিনিয়র তখন আলতোভাবে মুখের ভিতরে এক টিপ জরদা ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। "আমি? উস্‌প্‌ উস্‌প্‌, এখন আর ওসব ঝামেলায় যাবার বয়েস নেই ভাই। উস্‌প্‌ কোনওকালে পিঠটা সিধে ছিল কিনা মনে নেই। এখন সেটা বড্ড বেঁকে গিয়েছে। মেরামত আর সম্ভব নয়। আমার চাকরি আর ক'দিন। হাতে পায়ে ধরে একটা একস্‌টেনশন যদি নিতে পারি, বুঝব বাপের ভাগ্যি।"

লোকটা এবার একটু গরম হয়েই জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আপনার বিবেক এসব হীনতা সমর্থন করে?"

সিনিয়রের ততক্ষণে ঢুলুনি এসে গিয়েছে। "অ্যাঁ!" তিনি যেন চমকে উঠলেন। শব্দের অর্থটা বুঝতে সময় নিল। বিবেক? এবার বুঝলেন! এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নতুন কোনও মনিবের নাম নয়। বিবেক! "আমাদের বিবেক তো বেশ্যার আচার-নিষ্ঠার মত। একাদশীর দিন খদ্দেরকে মুখটা এঁটো করতে না দিলেই আর খুঁতখুঁতি থাকে না।"

সেই কোন কাঁচা বয়সে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করার পর লোকটা জীবনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আর একটা সুযোগ পেয়েছিল।

লোকটা

লোকটা উঠবার জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগল। কিন্তু অসম্ভব। গাড়ির সিটের সঙ্গে তাকে কে যেন জুড়ে দিয়েছে। ড্রাইভারকে বলতে চাইল, একটু মদত দাও না। একবার উঠি। কিন্তু দেখল সে তেমনি হাত পা ছেড়ে এলিয়ে পড়ে আছে।

৩

যন্ত্রণাময় শূন্য থেকে পাক খেয়ে পড়তে পড়তে এক সময় তার শরীরটা প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি খেল বলে লোকটার মনে হল। সে বুঝল তার পায়ের নিচে একটা শক্ত আশ্রয় আছে। অতি-কষ্টে সে একবার চেয়ে দেখল, চারদিক অস্পষ্ট, কুয়াশা। সামনে ট্যাকসিটা তেমনিভাবেই তাদের গাড়ির ভিতরে ঢুকে আছে। সরবার নাম নেই। পিল পিল করে পিঁপড়ের ঝাঁক এসে তাদের গাড়িটাকে, সামনের ট্যাকসিটাকে ক্রমাগত ছেকে ধরছে। একবার ভাবল, ঘুমন্ত ড্রাইভারটাকে একটা ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দেয়। রাস্তার মাঝখানে এইভাবে গাড়ি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া —এত ইয়ারকি ভাল নয়। ড্রাইভার এখন তারই ডিউটিতে আছে। এখন সে বোধহয় একটা ধমক দিতে পারে। না কী পারে না? একদিন ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। তার শরীরে আবার একটা প্রবল অস্বস্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। যদি সে জানতে পারত, তার অধিকার কতটুকু, তবে

গাড়িতে আরো অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে বসে থাকতে পারত। ড্রাইভারকে বকে-ঝকে গাড়িটা চালাবার ব্যবস্থা করতে পারত। সে মনস্থির করে মাথাটা তুলতে গেল। পারল না। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, এক সঙ্গে একশটা ষাঁড় তার বুকের পাঁজরে, মেরুদণ্ডে, তলপেটে, পাছায়, মগজে তীক্ষ্ণ শিং দিয়ে গুঁতো মারতে লেগেছে। অসহ্য। যন্ত্রণায় তার শরীরের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, ভিতরকার সবকিছু বেরিয়ে আসতে চাইছে। যন্ত্রণা বেড়ে উঠতেই তার চারপাশের কুয়াশা খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল। পিঁপড়েগুলোকে মানুষের মত দেখাতে লাগল। এত মানুষ আছে পৃথিবীতে! এত কী কথা বলছে ওরা? লোকটা একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করল। লোকগুলোর ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে ওদের কণ্ঠস্বরের তাল ঠিক থাকছে না। ঠোঁট নড়ছে যখন, তার অনেক পরে আওয়াজ বের হচ্ছে। লোকটা নিজের মনে বলতে চেষ্টা করল, ডাবিং ভাল নয়। পরমুহূর্তেই তার কানে কিছু সংলাপ বেজে উঠল।

প্রথম সংলাপ (উত্তেজিতভাবে): আরে মশাই, পাঁচ-সাত মিনিটও হয়নি। একেবারে আমার চোখের সামনে ট্যাকসিটা এসে গদাম করে গাড়িটাকে মেরে দিলে।

দ্বিতীয় সংলাপ (কাঁপা কাঁপা আওয়াজ): কি সাংঘাতিক! কি সাংঘাতিক!

প্রথম সংলাপ (উত্তেজিতভাবে): এ রকম অ্যাকসিডেন্ট আর কখনও মশাই, চর্মচক্ষে দেখিনি। চোখের উপর…

তৃতীয় সংলাপ (শান্তভাবে): এতে এখন আর আদৌ

অবাক হইনে। রোজই ঘটছে। কাগজ খুললেই দেখতে পাবেন।

দ্বিতীয় সংলাপ (কাঁপা কাঁপা আওয়াজ) ঃ কি সাংঘাতিক, কি সাংঘা—

লোকটার মগজে একটা লক্ষ পাওয়ারের বালব্ দপদপ করে জ্বলছে আর নিবছে। বালব্টা জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়-করা লোকগুলোর মুখ ওর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কিন্তু তখন তাদের কথা কানে ঢুকছে না। বালব্টা নিবতেই মুখগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, তখন কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে কানে বাজছে।

চতুর্থ সংলাপ (হন্তদন্ত হয়ে) ঃ কী হয়েছে মশাই, এখানে কী হয়েছে ?

পঞ্চম সংলাপ (বিদ্রূপের স্বরে) ঃ চশমাটা কী বিছানায় ফেলে এসেছেন ?

দ্বিতীয় সংলাপ (কাঁপা কাঁপা আওয়াজ) ঃ কি সাংঘাতিক। কি সাং—

চতুর্থ সংলাপ (চটে গিয়ে) ঃ আপনার গায়ে ফোসকা পড়ল না কি।

প্রথম সংলাপ (উত্তেজিতভাবে) ঃ আরে মশাই, উনি কী জানেন ? আমি সেই গোড়া থেকে আছি। আমারই চোখের উপর তো অ্যাকসিডেনটটা ঘটল। আঁচিয়ে উঠে ভাবলুম—

দ্বিতীয় সংলাপ (কাঁপা কাঁপা আওয়াজ) ঃ কী সাংঘাতিক।

তৃতীয় সংলাপ (নিরুত্তাপ) ঃ তা এ নিয়ে এত হইচই করার কী আছে ? ইট্ ইজ্ নিউজ নো মোর। পুলিশ-টুলিশে ফোন-টোন করুন। অ্যামবুলেনস ডাকুন। দেখুন কারো যদি

পরমায়ু এখনও থেকে থাকে। ভাবগতিক দেখে তো সুবিধে মনে হচ্ছে না।

লোকটা ভাবল, এরা খামখা বিদ্যে জাহির করছে। তার চেয়ে কেউ একজন এগিয়ে এসে যদি এক ঝাঁকানি দিয়ে তার ড্রাইভারটার ঘুম ছুটিয়ে দিতে পারত তো সে এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছে যেত।

প্রথম সংলাপ (উত্তেজিত): ভাবলুম বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। ভাবলুম তাহলে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিই। চট করে ঠাণ্ডা লেগে গেলে আবার বিপদে পড়ে যাব।

তৃতীয় সংলাপ (নিরুত্তাপ): ওই ফাঁকে ফায়ার ব্রিগেডকেও একটা খবর দিয়ে দিন।

পঞ্চম সংলাপ (বিদ্রূপের সুর): এখানে ফায়ার ব্রিগেড কী করবে মশাই? চিতেয় জল ঢালবে?

তৃতীয় সংলাপ (নিরুত্তাপ): কী করবে কী করে বলব? তবে দেখেছি কিছু করতে পারুক আর না পারুক, কল পেলে ওরাই তবু চট করে চলে আসে। আর সব মক্কেলের তো নড়তে চড়তে আঠারো মাসে বছর।

লোকটা ভাবল, আজ একটু সকাল করে বাড়ি পৌঁছুতে ইচ্ছে হয়েছিল। তা গেল তার বারটা বেজে।

প্রথম সংলাপ (উত্তেজিত): আমার আবার বড্ড সর্দির ধাত। খুব ভোগায়।

দ্বিতীয় সংলাপ (কাঁপা কাঁপা গলায়): কী সাংঘাতিক!

প্রথম সংলাপ: না না, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। আমি থরো চেক করিয়ে নিয়েছি। আমি—

লোকটার মনে বাড়ি যাবার ইচ্ছেটা শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল।

প্রথম সংলাপ : একস্-রে করিয়েছি—

লোকটা বলতে চাইল : আমার ড্রাইভারটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠিয়ে দিন তো। আমি বাড়ি যাব।

প্রথম সংলাপ : স্পুটাম্ ব্লাড্ সব করিয়ে নিয়েছি—

লোকটা বলতে চাইল : আমি বাড়ি যাব।

তৃতীয় সংলাপ (নিরুত্তাপ) : আজকাল একটা কুকুর মরলে মানুষের যতটা মনে লাগে, মানুষ মরলে তার বেশি না।

প্রথম সংলাপ : সব ক্লিয়ার—

পঞ্চম সংলাপ : ভাল একটা কুকুরের দাম কত জানেন? কোনও আইডিয়া আছে?

লোকটা বলতে চাইল : বাড়ি যাব, আমি বাড়ি যাব।

তৃতীয় সংলাপ : কুকুর মানে অ্যালসেশিয়ান নয়, রাস্তার নিতান্ত খেঁকি কুকুর।

প্রথম সংলাপ : আমার বউ বলে তোমার বাতিক—

লোকটা বলতে চাইল : বাড়ি যাব।

প্রথম সংলাপ : আমি বলি জীবনটা আগে। তাই সামান্য এদিক ওদিক হলেই—

তৃতীয় সংলাপ : ফোন-টোন একটা করা উচিত। খবর না পেলে পুলিশ-টুলিশ আসবে বলে মনে হয় না।

প্রথম সংলাপ : ডাক্তারের বাড়িতে ছুটি। সাবধানের মার নেই।

লোকটা বলতে চাইল : বাড়ি যাব, বাড়ি যাব। দুবার

হেঁচকি মত তুলল। তারপর সে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকল। চকিতে একবার তার জীবন-বীমার পলিসিটার কথা মনে পড়ল। "অ্যাকসিডেণ্ট কভার করিয়ে রাখুন" বীমা এজেনটের বিরাট চৌকো মুখ আর বড় বড় দাঁত বার করা সাহস জাগানো হাসি সেই ঘুমের ঘোরেও চকমক করে জ্বলে উঠল। "বলছি করে রাখুন, বেনিফিট আপনারই। প্রিমিয়াম নাম মাত্র। কিন্তু অ্যাকসিডেনটে মারা পড়লে ফ্যামিলি ডবল টাকা পেয়ে যাবে।" সে বোধহয় রিস্‌ক কভার করেছিল। করেছিল তো? তার ঠিক মনে পড়ল না। সেজন্য একটু অস্বস্তি হল। বিড় বিড় করে সে একবার বলল, "বাড়ি যাব, বাড়ি গেলেই জানা যাবে।" পরক্ষণেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এ খবরটা বের করা আদৌ কঠিন নয়। সেই বীমার এজেন্ট ভদ্রলোকের খাতায় তাঁর মক্কেলদের সব খবরই টোকা থাকে। সেই খাতাটি খুললেই এই তথ্যটি বেরিয়ে পড়ত যে, অনেক অফিস বদলে লোকটা যে-বছর একটা চাকরিতে পাকা হল, সেই বছরই প্রথম বীমাটা করেছিল। এটাও জানা যেত যে, তার একটু বয়েস হয়েছিল বলে প্রিমিয়ামটা বেশি পড়েছিল। প্রথম বীমার অঙ্ক ছিল দশ হাজার টাকা। স্যালারি সেভিংস্ স্কীমের সুবিধেটা সে নিয়েছিল। প্রিমিয়ামের টাকা তাই নিয়মিত অফিসই তার মাইনে থেকে পাঠিয়ে দিত। না হলে যা টানাটানির সংসার, প্রিমিয়ামের টাকা যে কতবার

বাকি পড়ত কে জানে ? সম্ভবত রিস্কটা সে কভার করেছিল। কারণ সেইবারই সে বিয়ে করেছিল। এবং একজোড়া উষ্ণ উরুর সদ্য সান্নিধ্য আর তার আনকোরা স্বাদ তাকে দিনকতক নিরাপত্তা বোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। পত্নীপ্রেমে তার টলটলে মন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। এবং তার রেশ যে পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত ছিল, তার প্রমাণও বীমা এজেনটের খাতা থেকে উদ্ধার করা যেত। কারণ তার বড় মেয়ের বয়স যখন তিন তখন বীমা এজেনট এবং তার স্ত্রীর যৌথ চাপে মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকার আর-একটা বীম করতে বাধ্য হয়েছিল। এটাও রিস্ক কভারের আওতায় পড়েছিল কি না, জানা নেই।

স্থায়ী চাকরি, নিয়মিত ইন্‌ক্রিমেনট, গুছানো স্ত্রী, সন্তান আর পনেরো হাজার টাকার বীমা। মধ্যবিত্তের জীবনে এটাকে 'স্বর্ণযুগ' বলতে বাধা কি ? এই সময়ে কোনও একদিন তার ফ্ল্যাটে গিয়ে চোখ বুলোলে দেখা যেত তক্তাপোশ, আলনা, আলমারি, মীট সেফ, বুক শেলফ, গ্রামোফোন, রেডিও এমন কি একটা ডাইনিং টেবিলও, হোক না পুরনো, তার স্ত্রীর তৎপরতায় ধীরে ধীরে ঘরে এসে জুড়ে বসেছে। নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন রাখতে তাকে সপরিবারে ট্যাকসি চেপেও মাঝে মিশেলে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে।

সংসারে মোটামুটি লোকটা যখন থিতু হয়ে বসেছে, ঠিক সেই সময় তার জীবনে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে গেল। এবং সেটা এতই অপ্রত্যাশিত যে তার মত হিসেবি লোকও ভারসাম্য রাখতে পারল না। হঠাৎ সে টের পেল অবাঞ্ছিত একটা অবস্থার

ফেরে সে পড়ে গিয়েছে। অথচ সেদিন সে সকালের প্রসন্ন হাসিটি দেখে বুঝতেই পারেনি, কী ছুরি সেই হাসির আড়ালে লুকনো ছিল। একটা খুশির আমেজ নিয়েই সে বিছানা থেকে উঠেছিল। শুয়ে শুয়ে এক কাপ গরম চা খেল। তারপর সহজেই যাতে বেগটা চাপে তার জন্য ঈশ্বরের কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাল। স্পষ্টতই বোঝা গেল, ঈশ্বর লোকটার জীবনে এখন ত্রিফলা, ইসগ্‌গুল অথবা নানাবিধ জোলাপের বিকল্প হিসাবে কাজ করে চলেছেন। তারপর আলস্য ভাঙবার জন্য শুয়ে শুয়েই সে বার কয়েক ব্যায়াম করল, আঙুলগুলো মটকালো, বাঁ পায়ের আঙুলগুলো পাশ বালিশের নরম পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করল। সদ্য স্নান সারা বউ তেল সাবানের একরাশ গন্ধ নিয়ে ঘরে ঢুকল। গায়ের আঁচলটা ফেলে দিয়ে কাঁচুলির হুক আটতে আটতে রোজকার মত প্রথম ডাকটা দিল, 'এই ওঠো।' সেও রোজকার মত সাড়া দিল না। তারপর তার বউ আয়নার উপর ঝুঁকে চিরুনি দিয়ে সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর লাগাতে লাগাতে দ্বিতীয়বার ডেকে উঠল, "এ-ই ওঠ্-ও-না।" সে একবার নাকি-সুরে খালি আওয়াজ দিল, "উঁ।" তার বউ এবার ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "আরে আরে তোমার মাথার কাছে খোকা। খোকা। আঃ কী জ্বালা! ওর হাত থেকে ওটা কেড়ে নাও না।" বউ চাপা একটা ধমক মারল ওকে। লোকটা ধড়মড় করে উঠে বসেই তার বাচ্চা ছেলেটার হাত থেকে তবক মোড়া পরিবার পরিকল্পনার ঠুসিটা কেড়ে নিলে। তার বউ গরম হয়ে বলল, "এত অসাবধান কেন তুমি? সামলে রাখতে পার না?" তারপর লোকটার

বেচারি বেচারি মুখখানা দেখে মুচকি হেসে গলায় একটু আলতো আদর ঢেলে আসল কথাটা বলল, "যাও, বাজার নিয়ে এস চটপট।"

সেদিন এটা তার স্পষ্ট মনে থাকার কথা যে, এক্সপ্রেস বাসটা সে ঠিক সময়ে ধরতে পেরেছিল। সেটা বেশ ফাঁকাই ছিল। অফিসে তার লেট হয়নি। ডেসপ্যাচ সেকশনের পানরসিক প্রৌঢ় সহকর্মীর কাছ থেকে যথারীতি একখিলি পান আর পিলাপাতি জরদা নিয়ে সে তার চেয়ারে এসে বসেছিল এবং প্রথম ঘণ্টা নিরুদ্বেগে কাজও করে গেল। একটু পরেই করেসপনডেনসের এক সহকর্মী তার কাছে এসে সকলের আগে দুঃসংবাদটা দিলেন। "শুনেছেন," তীক্ষ্ণকণ্ঠ বেজে উঠল, "ওভার টাইম বন্ধ হয়ে গেল। নিন এখন কাঁচকলা চুষুন।" ওধার থেকে একজন আঁতকে উঠলেন, "অ্যাঁ, বলেন কি! সর্বনাশ!" আরেকজনের আওয়াজ শোনা গেল, "আপনি কোত্থেকে জানলেন মশাই?" "আমি?" খ্যানখেনে সেই গলাটি বেজে উঠল, "নিজের চোখে দেখে এলুম যে টাইপিস্টদের ঘর থেকে। নোটিসটা সই হতে চলে গিয়েছে নতুন ম্যানেজারের ঘরে। এসে পড়ল বলে।" ওভার টাইম বন্ধ। তার মানে লোকটা নিজেকে যথেষ্ট সংযত রেখে ঠাণ্ডা মাথায় হিসেব কষতে লাগল, দেড়শ টাকা মাস থেকে কমে গেল। এ পর্যন্ত সে চট করে কষে ফেলতে পারল। তারপর একটা যোগের অঙ্ক আছে। বাড়িভাড়া+রেশন+মুদি+হরিণঘাটার দুধ + বেচুদার মনোহারি দোকান+দুই মেয়ের ইস্কুলের মাইনে+রোজকার বাজার+ধোপা + কয়লা + ঘুঁটে + কেরোসিন তেল+ঝি+

জমাদার+অফিসের যাতায়াত+টিফিন খরচ+চুরুট+(আর কি আছে সে মনে করতে চেষ্টা করল)। এই যোগটা বিশেষ কঠিন না। প্রতি মাসে যোগ করতে করতে ফলটা তার মুখস্থ হয়ে আছে। গতমাসে, দ্রব্যমূল্যে স্থির থাকার সংকল্পে অটল সরকার রেশনের চাল আর হরিণঘাটার দুধের দাম কিছুটা বাড়িয়েছিলেন বলে নতুন বছরে তার যোগফলটার কিছু হেরফের করতে হয়েছিল। কিছু বেড়েছিল। এর সঙ্গে আরও একটা অঙ্ক আছে। এবার সে মনে মনে সেইটে কষতে শুরু করলে। যথা: তার আয় অর্থাৎ মূল বেতন+ডিএ ওভারটাইম—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড—ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম-আয়কর-অফিসের দেনার কিস্তি—কো-অপারেটিভের দেনার কিস্তি—সহকর্মীদের কাছে খুচরো দেনা—অদৃশ্যভাবে আর কি থাকতে পারে সে ধীরে সুস্থে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল। হ্যাঁ, মনে পড়ল, ওভারটাইম। সে ওভারটাইমকে যত্ন করে ধন চিহ্নের ঘর থেকে তুলে এনে ঋণ চিহ্নের ঘরে বসিয়ে দিল। তারপর যোগ বিয়োগ করে তার নীট আয়ের নীচে নীট ব্যয়টা বসালো। এবারে বিয়োগ করলেই কিন্তু নীট ফলটা বেরিয়ে আসত। কিন্তু লোকটা ভরসা পেল না। তার গলাটা কেমন শুকিয়ে এল। তার কপাল ঘেমে উঠল, ঘামের একটা স্রোত শিরদাঁড়া বয়ে নীচের দিকে নেমে চলল।

নোটিশটা এল টিফিনের পরে। কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে কোমপানিকে বাঁচাতে হলে

মরীয়া হয়ে ব্যয়সংকোচ এবং সেই সঙ্গে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। তাই কোমপানি এবং তার কর্মীদের স্বার্থে ব্যয় সংকোচের প্রথম সোপান হিসাবে ওভারটাইম বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কর্মীরা যাতে হাতের জমানো কাজ শেষ করে যেতে পারেন সেইজন্য কাজের সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া হল। কোমপানি আশা করছে যে, কর্মীরা এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

অ্যাকাউন্ট সেকশনের কর্মী টেবিল থাবড়ে বলে উঠলেন : কোম্পানির অবস্থা মোটেই খারাপ নয়। আমি ব্যালান্স্ শীট দেখেছি।

করেসপনডেনস সেক্শনের কর্মী : কোম্পানি আগের চাইতে অরডার বেশি পাচ্ছে।

উত্তেজিত কণ্ঠ : যত ব্যয় সংকোচ আমাদের বেলায়। কোম্পানির অবস্থা যদি এতই খারাপ তো নতুন নতুন গাড়ি আসছে কী করে ?

খ্যানখেনে আওয়াজ : ম্যানেজারের বাড়ি তোলার জন্য যে এক কাঁড়ি টাকা অ্যাড্ভানস দেওয়া হল, সে টাকা কোত্থেকে এল ?

কৌতূহলী কণ্ঠ : কত টাকা মশাই ?

অস্থির কণ্ঠ : এক লাখ।

উত্তেজিত কণ্ঠ : এসব নতুন ম্যানেজারের বদমায়েসি। আমাদের পেট মেরে কোম্পানিকে কাজ দেখাচ্ছে। ওদিকে নিজে খলখলে করে ছেড়ে দিচ্ছে।

অস্থির কণ্ঠ : এর একটা বিহিত করা দরকার।

স্থির কণ্ঠ : বিহিত কি করবেন, শুনি ?

খ্যানখেনে আওয়াজ : প্রতিবাদ জানাতে হবে।

মোটা আওয়াজ : কিসের প্রতিবাদ ?

অস্থির কণ্ঠ : অন্যায়ের প্রতিবাদ।

সরু আওয়াজ : দৃঢ়কণ্ঠে দাবি জানাতে হবে।

স্থির কণ্ঠ : কী দাবি জানাবেন ?

সরু আওয়াজ : ওভারটাইম বন্ধ করা চলবে না।

মোটা আওয়াজ : সে দাবি আমরা করতে পারিনে।

খ্যানখেনে আওয়াজ : থামুন মশাই, দালালি করতে বলা হয়নি আপনাকে।

মোটা আওয়াজ : আহা, শুনুনই না। খামাখা মাথা গরম করছেন! ওভারটাইম করানো না-করানো কোম্পানির ইচ্ছে। আমরা শুধু বলতে পারি—

উত্তেজিত কণ্ঠ : থামুন, থামুন। ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে কথাটা বলুন। কাজে লাগবে।

মোটা আওয়াজ : আমরা শুধু বলতে পারি বাড়তি সময়—

উত্তেজিত কণ্ঠ : আপনি থামুন।

মোটা আওয়াজ : বাড়তি সময় খাটালে ওভারটাইম—

উত্তেজিত কণ্ঠ : আপনি থামুন।

অস্থির কণ্ঠ : হ্যাঁ থামুন।

মোটা আওয়াজ : ওভারটাইম আমাদের দিতে হবে।

খ্যানখেনে আওয়াজ : থামুন মশাই, থামুন। দালালি করতে হয়—

স্থির কণ্ঠ : কেন, উনি অন্যায় কথা কী বলেছেন ? ঠিকই

তো বলেছেন, ওভারটাইম করব বলে আমরা দাবি তুলতে পারি না। আমরা বরং এই দাবি তুলতে পারি, আমরা বাড়তি বেগার খাটব না। অতিরিক্ত সময় কাজ করলে তার মজুরি দিতে হবে।

খ্যানখেনে আওয়াজ : হ্যাঁ, তাই তো, এটা তো ন্যায্য কথা।

স্থির কণ্ঠ : তবে এতক্ষণ ধরে এত আওয়াজ ছাড়ছিলেন যে ?

অস্থির কণ্ঠ : উনি নতুন কথাটা কী বললেন।

সরু আওয়াজ : যাক গে যাক, এখন আমাদের করণীয় কি ?

উত্তেজিত কণ্ঠ
অস্থির কণ্ঠ
খ্যানখেনে আওয়াজ } ম্যানেজারকে ঘেরাও করি গে চলুন।

অ্যাকাউনট্‌স্ কর্মী
করেসপনডেনস কর্মী
স্থির আওয়াজ } প্রথমেই এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক হবে না।

মোটা আওয়াজ : প্রথমে বরং সকলে মিলে একটা দরখাস্ত করি।

করেসপনডেনস : আবার সই-ফইএর ঝামেলায় যাওয়া কেন ? সেটা আবার রেকরড হয়ে থাকবে। তার চেয়ে মুখে গিয়ে বললেই ভাল হত না। যান না আপনারা।

অ্যাকাউনট্‌স্ কর্মী : হ্যাঁ, সেই ভাল। সকলে মিলে হৈচৈ না করে, একজন মুখপাত্র নির্বাচন করাই ভাল। তিনি বেশ গুছিয়ে আমাদের ফিলিংসটা ম্যানেজারকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। মাথা গরম করে তো লাভ নেই।

হঠাৎ তিনি লোকটার দিকে চাইলেন। "কি মশাই, চুপচাপ বসে আছেন যে বড়, আপনিই যান না।"—

লোকটা কেন জানি না, আচমকা এই প্রস্তাবটা শুনে চমকে উঠেছিল। "আমি!"

তারপর সে লক্ষ্য করে দেখল, সবাই তার দিকে কেমনভাবে যেন চেয়ে আছে। সে হঠাৎ কিছু না ভেবেই পালাতে চাইল। কিন্তু অসম্ভব। সহকর্মীদের দৃষ্টিগুলো তাকে ততক্ষণে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আত্মরক্ষার সহজাত আদিম প্রবৃত্তিটা তাকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিতে থাকল।

"হ্যাঁ, আপনি।" অ্যাকাউনটস্ বিভাগের সহকর্মী লোকটার দিকে চেয়ে হাসলেন। "আমরা দেখেছি, আপনি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।"

"তা ছাড়া," করেসপনডেনস কেরানীটা বলল, "সাহেব আবার তোমাকে একটু নেকনজরে দেখে ভায়া। কেমন চটপট তোমার দুটো ইনক্রিমেনট করিয়ে দিলে, তাও তো দেখলুম। তুমি কথাটা বললে, হয়ত প্রপার লাইটে নেবে। নইলে যা টেমপার সাহেবের, অন্য কাউকে দেখলে হয়ত তেলে-বেগুনে জ্বলেই উঠবে। ভাববে আমরা হয়ত এজিটেশন করছি।"

"আপনারা ভুল বুঝেছেন", লোকটা মরীয়া হয়ে কথাটা তার সহকর্মীদের কানে ছুঁড়ে দিল। তার নিজের কানেই নিজের কণ্ঠস্বর কেমন যেন অহেতুক কর্কশ মনে হল। একটু লজ্জা পেল সে। আসলে সে মিনতি করেই বলতে চাইল, ম্যানেজারের সঙ্গে আমার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নেই।

আপনাদের মতই আমি ওকে ভয় করি, তফাতে থাকি। এড়িয়ে চলতে চাই। দুবার আমার মাইনে বাড়িয়েছে, এটা ঠিক। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে, এটাকে নেকনজর বলতে পারেন। কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন, আমাকে অমানুষিক খাটায়, চার-পাঁচজনের কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। বিশেষ করে ওর নিজের কাজ যখন জমে যায়। আপনারা যখন বাড়ি চলে যান, আমি তখনও অফিসে। অনেক অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে থাকতে হয়। তাই অফিসের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দেয়। সত্যি বলছি। কি জানেন, আমাকে একটা কাজ করতে বললে আমি ওর মুখের উপর কিছুতেই না করতে পারিনে। কেমন যেন, কেমন যেন ভয় হয়, গা ছমছম করে। হুকুম মানি বলেই যা একটু পেয়ার করে। না মানলে আমাকেও লাথি মারবে। এই কথাগুলোই সে তার সহকর্মীদের বলতে চেয়েছিল হয়ত। কিন্তু বলতে গিয়ে বেধে গেল। সে বলল, "আমাকে আপনারা যা ভাবছেন, সে কাজ (আমি করতে পারব না) আমার দ্বারা ভালভাবে (আমি পারব না, পারব না) হবে বলে (আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না, দোহাই) আমার বিশ্বাস নেই। আপনারা বরং উপযুক্ত একজন কাউকে—"

অস্থির কণ্ঠ : আরে মশাই, আমরা লোক চিনি। ইউ আর দি ফিটেস্ট ম্যান।

(না না, লোকটা ছটফট করতে লাগল, আমি নই। আমি এর মধ্যে নেই।)

উত্তেজিত কণ্ঠ : আর এ তো আপনার ব্যক্তিগত কোনও

ব্যাপার নয়, কালেকটিভ্ ডিম্যান্ড। এতে তো ভয় পাবার কিছু নেই। আমরা সকলেই আপনার পিছনে আছি।

লোকটা যথেষ্ট বিপন্নভাবে হাসল। বলল, "আমি তো আমাকে চিনি, আমাকে দিয়ে, এ রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ—"

অস্থির কণ্ঠ : আপনাকে দিয়েই হবে।

উত্তেজিত কণ্ঠ : আমাদের দাবিটা কি অন্যায় ? বলুন।

সে বলল, "না।"

অস্থির কণ্ঠ : আপনি কি এটা সমর্থন করেন না ?

সে বলল, "করি।"

করেসপনডেনস কেরানী : তোমার মধ্যে একটা বিরাট তেজ লুকিয়ে আছে ভায়া। এ উপকারটুকু তোমাকে করতেই হবে। তুমি বরং আজই এক সময় সাহেবের কাছে কথাটা পেড়ে রেখো।

খ্যানখেনে আওয়াজ : উপকার বলছেন কি ? ওর স্বার্থও তো জড়িত।

লোকটা বলল, "সে তো আমি স্বীকারই করছি। কিন্তু কাজটা ভালভাবে করে উঠতে পারব কি না—"

উত্তেজিত কণ্ঠ : করতে চান না, তাই বলুন।

(লোকটা এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ঠিক ধরেছে।)

উত্তেজিত কণ্ঠ : ভাবছেন, ম্যানেজার আপনার উপর বিরূপ হয়ে উঠবে ?

(লোকটা ভাবল, এ কি অন্তর্যামী ?)

উত্তেজিত কণ্ঠ : এবং তাতে আপনার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

(লোকটা মনে মনে বলল, ঠিক, ঠিক ধরেছেন। বুঝতেই তো পারছেন। আমাকে রেহাই দিন, প্লীজ।)

উত্তেজিত কণ্ঠ : তার মানে আপনার নিজের স্বার্থটুকু বজায় রাখতে গিয়ে, আর সকলের কমন স্বার্থ যদি ভেসেও যায়, তাতে আপনার কিছু যায়-আসে না, কেমন ?

হঠাৎ কথাটা তার কানে ভাল ঠেকল না। সে দেখল, সবাই তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কতগুলো চোখ, বাপ! এই জিনিসটাকেই, এই লজ্জাকর নোংরা সত্যটাকে সে এতক্ষণ অতি যত্নে চাপা দিয়ে রেখেছিল। তার সহকর্মী এক হেঁচকা টানে তাকে যেন উলঙ্গ করে দিলে।

লোকটা যেন ডুমুরের পাতা দিয়ে লজ্জা ঢাকতে চাইছে, এমনিভাবে বলে উঠল, "না না, ঠিক তা নয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার ক্ষমতা কতটুকু, আন্তরিকভাবে তাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। আপনারা যাতে অপাত্রে আপনাদের বিশ্বাস ন্যস্ত না করেন, সেই জন্যই হুঁশিয়ার করতে চেয়েছি।"

করেসপনডেনস কেরানী : নাও নাও ভায়া, আর বিনয় করতে হবে না। তুমি যে কী তা আমি তো জানি। তুমি যে এ ব্যাপারে অতিশয় যোগ্য পাত্র, আমার সে বিশ্বাস কেউ টলাতে পারবে না।

লোকটা জানে, ইনি ডাঁহা মিথ্যা বলছেন। আর সকলে তাকে যতটুকু চেনে, তার বেশি ইনি যে কী করে চিনলেন, সে তা বুঝতে পারল না। না বুঝতে পারুক, কিন্তু এঁর কথাগুলো শুনতে তার খুব খারাপ লাগল না।

অ্যাকাউন্টস্ কেরানী : আমরা যে আপনার উপর নির্ভর করে আছি।

লোকটা জানে এটাও মিথ্যা। তবু লোভি বোয়াল মাছের মত এই টোপটাকে সে গিলল। ক্লান্ত চোখে সহকর্মীদের দিকে চেয়ে নিস্তেজ গলায় বলল, "দেখি কী করতে পারি। আমাকে একটু সময় দিন।" আর সহকর্মীরা বেরিয়ে যেতেই সে নিজেকে আপাদমস্তক চাবকাতে চাইল। সে স্বার্থপর, নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য অন্যের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে সে কুণ্ঠিত নয়, এই সরল কথাটা স্বীকার করে ফেললেই চুকে যেত। সে রেহাই পেতে পারত। কেন সে কথাটা স্বীকার করল না, কেন পারল না, কেন কথাটা তার গলায় বেধে গেল, এই যন্ত্রণাদায়ক রহস্যের কিনারা লোকটা করতে পারল না। দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর শান্ত, নিরুত্তেজ এবং স্পষ্টভাবে প্রশ্নটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মারল, "আমি কি আস্ত একটা সং নই?"

ঘুলঘুলি দিয়ে একটা মোটাসোটা টিকটিকি বেরিয়ে এল। দ্রুতপায়ে সড়সড় করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। যেন মরেই গিয়েছে। সাঁ করে বাঁ দিকে খানিকটা সরে গেল। থামল। মড়ার মত আবার নিথর। এবার অতি সন্তর্পণে উপরের দিকে এগুতে থাকল। আবার থামল। আবার স্থির। আবার নিথর। আবার দ্রুতপায়ে ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল।

একটু থামল। মাথাটা নিচের দিকে ঘুরিয়ে নিল। আবার স্থির। একেবারে মড়া। আসলে ঘাপটি মেরে আছে, সে ভাবল। আর নড়ছে না। নড়ছে না। নড়বে না? কী মতলব? লোকটা দেওয়ালটা আতিপাঁতি করে খুঁজল। কোথাও কোন শিকার তো দেখতে পেল না। তবে? হঠাৎ লোকটা দেখল টিকটিকিটা তার দিকে চেয়ে আছে। ছুটো চোখ স্থির হয়ে আছে তার উপর। সেই চোখ। কিছুক্ষণ আগেও যে-গুলো এই ঘরে ছিল। তাকে চেয়ারের সঙ্গে ঠেসে ধরে রেখেছিল। তাকে উঠতে দেয়নি। পালাতে দেয়নি। তার সহকর্মীরা সেগুলোকে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে ভেবে লোকটা একটু নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। সে আবার দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। না, এখনও টিকটিকিটা ওখানেই লেপটে আছে। তেমনি ওর দিকে স্থির হয়ে আছে তার শিকারী চোখ ছুটো। তার শরীরটা হঠাৎ কেমন হিম হয়ে এল। ফিসফিস করে সে বলল, "ওকে পাহারা দিতে রেখে গিয়েছে।" থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা টেবিল থেকে অ্যাসট্রেটা তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারল। ধাতুর অ্যাসট্রেটা ছু'ভাগ হয়ে ছু'দিকে ছিটকে গেল। একরাশ ছাই, পোড়া সিগারেট আর চুরটের গোড়া ছড়িয়ে পড়ল। টিকটিকিটা মরেনি। কিন্তু পালিয়েছে। উফ্, সে অনেকটা হালকা বোধ করল। সে খামাখা ভয় পেয়েছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে পরিপাটি করে সে কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

বেয়ারা এসে খবর দিল সাহেব তলব করেছেন। কিছুক্ষণ সে ওই টিকটিকিটার মত নিথর হয়ে বসে রইল। তারপর

ম্যানেজারের ঘরে যাবার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে মনকে প্রবোধ দিল, ভয়কে অনর্থক আস্কারা দেওয়া ঠিক নয়। আমিও মানুষ, উনিও মানুষ।

লোকটা করিডর থেকেই দেখল তার এক সহকর্মী ম্যানেজারের ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। মুখখানা তার মড়ার মত ফ্যাকাশে। চোখ দুটো নিস্তেজ।

উত্তেজিত কণ্ঠঃ টের পেয়ে গিয়েছে মশাই। সব রিপোরট পেয়ে গিয়েছে। কোনও শালা চুকলি খেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যাক, সাহেব তাহলে জেনে গিয়েছেন! সে কেমন স্বস্তি বোধ করল। তাকে আর তাহলে দরবার করতে হবে না। বাঁচা গেল!

উত্তেজিত কণ্ঠঃ উঃ কী গরম। খেপে আগুন হয়ে আছে। যেন চিবিয়ে খাবে। অতি কষ্টে রেহাই পেয়েছি। দোহাই স্যর, আমার নামটা বলে দেবেন না। ছা-পোষা মানুষ, মরে যাব।

লোকটার দুটো হাত তিনি জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর চুপসানো মুখখানা দেখে লোকটার মায়া হল। কী ভয়ই না পেয়েছে! তার মনে হল, এই আমার আপন জন। এঁকে আমি বুঝতে পারি।

ম্যানেজার তাকে দেখেই ফেটে পড়লেন। "কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এতক্ষণ কী ঘোঁট পাকানো হচ্ছিল!"

লোকটা মনে মনে নিজের মুখখানার সঙ্গে সহকর্মীর সেই চুপসানো মুখটার তুলনা করবার চেষ্টা করল। আমি কি ওর চাইতেও বেশি ভয় পেয়েছি? নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা

করল। তারপর ভাবল, সে যদি ম্যানেজারের চোখে চোখ রেখে কথা বলে, তাহলে কি ভয়ের ভাবটা কমবে? প্রথমেই অতটা ওঠা কি সমীচীন হবে? বরং ধীরেসুস্থে এগুনোই ভাল নয় কী?

ম্যানেজার যেন লাফিয়ে পড়বেন, এইরকম ভাবে টেবিলে ঝুঁকে গর্জে উঠলেন, "শুয়োরের বাচ্চাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।"

সে নিজেকে বলল, আমাকে বোধ হয় বলছেন না। আমি তো সিংগুলার নাম্বার। তাহলে তো শুয়োরের বাচ্চাই বলতে পারতেন। কিন্তু উনি বলছেন তো প্লুরালে। ওই গালাগাল কি আমার গায়ে লাগছে?

লোকটা নিশ্চিত হবার জন্য ম্যানেজারের দিকে চাইল। চোখে চোখে নয়, প্রথমে সে নজর ফেলল ম্যানেজারের ভুঁড়ির উপর। সত্যিই রেগেছেন ম্যানেজার। ভুঁড়িটা হাপরের মত ওঠা-নামা করছে।

"আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকানো হচ্ছে। ষড়যন্ত্র চলেছে। আমি সব খবর পেয়েছি। কুকুরের বাচ্চারা সব। লাথি মেরে বের করে দেব।"

লোকটা দেখল, ম্যানেজারের প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভুঁড়ির আন্দোলনের হেরফের হচ্ছে। তুড়ুক তুড়ুক করে কেমন লাফিয়ে উঠছে। সে বুঝল, কথাগুলো নাভিদেশ থেকে আসছে। একবার ভাবল, ম্যানেজার মনেপ্রাণে তাদের ঘৃণা করে, খুব গভীরভাবেই ঘৃণা করে। পরক্ষণেই সে ম্যানেজারের মনের গভীরতা পরিমাপ করতে কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ম্যানেজারের মনের গভীরতা কতখানি? তলদেশের সীমা কতদূর? নাভিমূলেই শেষ, না কি রেকটাম পর্যন্ত? এতক্ষণ ম্যানেজার তাঁর গালিগালাজ বহুবচনেই নিবদ্ধ রেখেছিলেন বলে স্বস্তির সঙ্গে লোকটা তার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারছিল। ভাবছিল, ম্যানেজার ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে তার ঘরে ফিরে মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবে। হঠাৎ তার খেয়াল হল, এবার ম্যানেজার তাকে লক্ষ্য করেই কিছু যেন বলছেন।

"কি, ধ্যান করছ নাকি? না ঘুমিয়ে পড়েছ? কথা কানে ঢুকছে না, ইডিয়েট, রাসকেল কোথাকার!"

এবার ম্যানেজার সিংগুলারেই বলছে। লোকটার বুঝতে আর ভুল হল না। তার মানে আমাকেই এবার বকছে।

"সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কি, উত্তর দাও। আনসার মী।"

ম্যানেজার কী জানতে চাইছেন সে বুঝতে পারল না। আসলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে, সেইজন্য অনুশোচনা হতে লাগল তার। সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে নেই। তাতে সাহেবের নোশন খারাপ হয়। সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকাই কেরানী-জীবনে উন্নতির সোপান। তার অপরাধবোধ তাকে বিলক্ষণ পীড়া দিতে লাগল। কী যে উনি জিজ্ঞেস করেছেন, সেটা যদি একবারটি জানতে পারত!

"উল্লুক!" একটা বিস্ফোরণ। ভুঁড়িতে একটা তুড়ুক লাফ। "সোয়াইন!" আর একটা বিস্ফোরণ। আরেকটা তুড়ুক লাফ। "ভেবেছ যে মটকা মেরে থাকলেই পার পাবে!" ম্যানেজারের মুখখানা অসম্ভব হিংস্র হয়ে উঠেছে। দমকে দমকে তাঁর ভুঁড়িটা তুড়ি-লাফ দিচ্ছে। ভয়ে ভয়ে সে সাহেবের

চোখের দিকে মিটমিট করে একবার চেয়েই চোখ নামিয়ে নিল! সেই টিকটিকির চোখ-জোড়া তার দিকে চেয়ে আছে। ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোতটা আবার নেমে চলেছে, সে টের পেতে লাগল। তার এ-ও একবার মনে হল, এই স্রোত এখনিই বন্ধ করা দরকার! একটা অ্যাসট্রে ছুঁড়বার জন্য তার হাতখানা নিশপিশ করতে লাগল।

"অফ অল পারসনস, তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি। অকৃতজ্ঞ, বেইমান, কুকুর। তুমি না কনডেমড্ হয়ে পড়েছিলে! আমি তোমাকে নর্দমা থেকে তুলে আনিনি? ভাল জায়গায় বসিয়ে দিইনি?"

সে বলতে চাইল, ঠিকই স্যর, আমি স্যর এই কথাটা ওদের প্রাণপণে বোঝাতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন স্যর, ওরা বুঝতে চায়নি।

"পর পর দুটো ইনক্রিমেনট করে দিইনি?"

সে বলতে চাইল, হ্যাঁ স্যর। অস্বীকার তো করিনি। প্রথম ইনক্রিমেনটের টাকা দিয়ে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড পাখা কিনে মায়ের ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম স্যর। বয়েস হয়েছে, আজকাল আর গরম একদম সহ্য করতে পারেন না। দ্বিতীয় ইনক্রিমেনট দিয়ে আমার স্ত্রী একটা রেডিও কিনেছিল স্যর। ওর খুব রেডিওর শখ। অনেকদিন থেকে বায়না ধরেছিল। আমি কিন্তু ওদের বলেছিলাম, যদি কোনদিন আমার বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ে স্যর, আপনি আমার মাকে, বউকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন, কি বলেছিলাম। মাকে বলেছিলাম, এই যে পাখাটা এল, এখন আর হাত-পাখা ঠেলে

ঠেলে যে তোমার ডানা ব্যথা হবে না, মশার কামড় খেয়ে আর যে ছটফট করে দাপিয়ে রাত কাটাতে হবে না, সুইচটি টিপলেই আরামে তোমার চোখ বুঁজে আসবে মা, আর ভাল করে ঘুমুতে পারলেই তোমার অর্ধেক রোগ সেরে যাবে, মেজাজও ভাল হবে, আর তাহলে তোমার ছেলের বউকে হয়ত আরও একটু ভাল লেগে যাবে, এ সব মা, কার জন্য হল জান? এ সবই সাহেবের দয়ায়। না স্যর, একটু মিথ্যে কথাও বলেছিলাম, সাহেব বলিনি, একটু অন্তরঙ্গতা দেখাবার জন্য মার কাছে বউয়ের কাছে আপনাকে "দাদা" বলে উল্লেখ করেছিলাম।

"আর তার প্রতিদানে তুমি আমার বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছ! দল পাকাচ্ছ!" ম্যানেজারের ভুঁড়ি বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইল।

না স্যর, লোকটা বিপন্ন হয়ে প্রতিবাদ করতে চাইল, আমি ওদের, বিশ্বাস করুন স্যর, ওদের বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, ওদের মুখপাত্র হিসেবে দাবি জানাবার আমার কোনও যোগ্যতা নেই। আমার কোনও অধিকার নেই। আমাকে রেহাই দিতে, আমাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। ওদের বোঝাতে পারিনি যে, আমাকে আমি বিক্রি করে দিয়েছি। নীলামে যে সব থেকে বেশি ডাক দিয়েছে সে-ই আমাকে কিনে রেখেছে। স্থায়ীত্বই আমার প্রভু। আমি এখন নিরাপত্তার ভূমিদাস ছাড়া আর কিছু নই। আমাকে নিয়ে আপনার উদ্বেগের কোনও কারণ নেই স্যর। বিশ্বাস করুন, কারোর কোনও ভাল বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার আর ধক নেই স্যর।

"দল পাকাচ্ছ, সোয়াইন।" ম্যানেজারের ভুঁড়ি তুড়ুক তুড়ুক করে ঠেলে উঠল।

আর এতক্ষণে লোকটার গলাতেও কথা ফুটল। এতক্ষণে সে একটা কিছু বলার পেল। সে নিচু গলায় বলল, "দল আমি পাকাইনি স্যর। আপনি মিছে রাগ করছেন।"

"মিথ্যে বলতে লজ্জা করছে না।"

"না স্যর," লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল। তার কপালে গুড়ি গুড়ি ঘাম ফুটে উঠল। তারপর একটু সহজ হতে চেষ্টা করল। বলতে চাইল, আমরা এমন কিছু করিনি যাতে আপনি এতটা খেপে যেতে পারেন। সবটা শুনলে হয়ত আপনিই লজ্জা পাবেন।

"তুমিই পালের গোদা, এই হচ্ছে আমার ইনফরমেশন।"

সাহেব একা আমাকেই জড়িয়ে ফেলতে চাইছেন। সে রীতিমত বিপন্ন বোধ করল। "না স্যর, সবটা শুনলে—"

"শাট্ আপ, তুমিই রিং লীডার।"

"না স্যর,আমরা—" বলতে গিয়ে লোকটা একটু থমকে গেল। না, এখানে "আমরা" বলাটা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। তার স্বাভাবিক যুক্তিবোধ তাকে সতর্ক করে দিল, "আমরা" বললে তুমিও জড়িয়ে পড়বে। সে একটু ঢোঁক গিলে বলল, "ওরা স্যর—"

ম্যানেজারের মুখে এতক্ষণে একটা জয়ের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। হুংকার দিয়ে বললেন, "হু আর ওরা, নাম বল, আমি সব ক'টাকে শায়েস্তা করছি।"

নাম জানতে চাইছেন ম্যানেজার। আমাকে কি চুকলি কাটবার জন্য ডেকে এনেছেন? লোকটার শরীরের মধ্যে

কেমন যেন করে উঠল। সে মনে মনে ছটফট করতে লাগল। বলল, "বিশ্বাস করুন স্যর, আমি এর মধ্যে নেই।"

ম্যানেজার ধমক দিলেন, "তবে যারা আছে, তাদের নাম বল। নেইম দেম। না কি তাও জান না।"

লোকটা কি করবে ভেবে পেল না।

ম্যানেজার বললেন, "ভেব না, নামগুলো আমি জানিনে। আমি সব জানি। তুমি সত্যিই কতটা লয়্যাল, কতটা অনেস্ট, কতটা সত্যবাদী, সেইটাই যাচাই করতে চাই। ডিসলয়্যাল লোক এই প্রতিষ্ঠানে যাতে আর একটাও না থাকে, তার ব্যবস্থা আমাকে নিতে হবে। যাও, তাদের একটা লিস্ট তৈরি করে নিয়ে এস। তারপর আমি দেখছি। নেমকহারামের জায়গা এই কোমপানিতে নেই। যাও, উল্লুকের মত আর দাঁড়িয়ে থেকো না।"

লোকটার মনে হল, বোঁ বোঁ করে অফিসটা ঘুরছে। কোনও রকমে নিজের ঘরে এসে চেয়ারে বসেই মাথাটা টেবিলে রেখে চোখ বুঁজে দোলানিটা বন্ধ করতে চাইল।

কোন্‌টা নেমকহারামি? লোকটা প্রশ্ন করল। যে-কোমপানির সে অন্নদাস, যে ম্যানেজারের কাছে সে ব্যক্তিগত-ভাবে উপকৃত তাঁর হাতে তার সহকর্মীদের ভবিষ্যৎ সমর্পণ করা? না, যে সহকর্মীরা তার উপর আস্থা রেখেছে তাদের সেই আস্থার মর্যাদা রেখে ম্যানেজারের আদেশ অমান্য করা? এই প্রশ্নের

সামনে দাঁড়িয়ে সে বোবা হয়ে গেল। পাছে চোখ চাইলে এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, তাই সে প্রাণপণে চোখের পাতা দুটোকে ঠেসে বন্ধ করে রাখল। আঃ, যদি সে এখন ঘুমিয়ে পড়তে পারত! আর সেই ঘুম যদি না ভাঙত। আজ নয়, কাল নয়, কোনদিনই না ভাঙত!

ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতেই বা বাধাটা কোথায়? তার এত বিচলিত বোধ করবারই বা কারণ কী? সে তো উপযাচক হয়ে ম্যানেজারকে নামগুলো দিতে যায়নি। বরং ওদেরই কেউ গিয়ে চুকলি খেয়ে এসেছে। তবে? এর মধ্যে তার হাতটা কোথায়? সাহেব সবই জানেন। তার জানানোয় না-জানানোয় কিছু যাবে আসবে না। তিনি আমাকে যে তালিকা পেশ করতে বলেছেন, সে শুধু আমার সততা আর আনুগত্য যাচাই করার জন্য। এটা করার অধিকার সাহেবের আছে বলে লোকটার মনে হতে লাগল। অধস্তন কর্মচারীদের সততা, কর্মনিষ্ঠা এবং আনুগত্য, চূড়ান্ত আনুগত্যের উপর ভর দিয়েই প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে থাকে। অতএব যতদিন তুমি এই প্রতিষ্ঠানে আছ, লোকটা নিজেই এখন সাহেবের ভূমিকা নিল, নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এই প্রতিষ্ঠানের অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছ, ততদিন তুমি একান্ত অনুগত, কুকুরের মত প্রভুভক্ত থাকতে ন্যায়ত, ধর্মত এবং আইনত বাধ্য। যুক্তিটা খাড়া করে সে যেন শক্ত মাটিতে পা দিল। আর সে অবাক হয়ে ভাবল, তাহলে মিছেই সে এতক্ষণ বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কুকুরের মত প্রভুভক্ত থাকতে সে ন্যায়ত, ধর্মত এবং আইনত বাধ্য। আর সেইটেই আসল কথা। ক্রমশ তার সামনে থেকে

কুয়াশাটা কেটে যাচ্ছে, ক্রমশ সে হাতে পায়ে জোর পাচ্ছে। হ্যাঁ, এবার, লোকটার মনে হতে লাগল, এবার বোধহয় সে চোখ মেলতে পারে। যে-সব সহকর্মী ম্যানেজারের নোটিসটার বিরুদ্ধে অসন্তোষ জানিয়েছিল, এবার বোধ হয় সে তাদের নামের তালিকাটা তৈরি করতে পারে। ন্যায়ত, ধর্মত এবং আইনত আমি কুকুর হতে বাধ্য। কুকুর হতে বাধ্য? এ কী ভাবছে সে! তার ভাবনাটা হোঁচট খেয়েই যেন থমকে গেল। হ্যাঁ, ঠিকই ভাবছে। এখন আমার আদর্শ কুকুর। কারণ কুকুরের আনুগত্য বিচারহীন এবং সেই কারণেই তা প্রশ্নাতীত। তবে কি আমি কুকুর হব? কুকুর? লোকটা অনুভব করল, তার পায়ের নিচেকার মাটি আবার পিছলে সরে যাচ্ছে। আবার রাশি রাশি কুয়াশার স্তূপে সে তলিয়ে যাচ্ছে। না, আর পিছলে পড়া চলবে না। শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে হবে। বিপন্ন-ভাবে হাত বাড়িয়ে লোকটা শেষ আশ্রয় হিসাবে মুঠো করে ঈশ্বরকে ধরতে চাইল। মরীয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তবে কি আমি কুকুর হব?" উত্তর পেল না। পায়ের তলে কোনও আশ্রয়ও না। সে প্রাণপণে চোখ বুঁজে টেবিলে মাথা রেখে বসে রইল। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল। তারপর যখন বুঝল, জবাব আর আসবে না, নিরুত্তেজ কণ্ঠে তখন বলে উঠল, "তুমিও শালা আমারই মত অণ্ডকোষহীন। সাইফার। অথচ কাউকে তা বোঝাতে পারিনে। তুমিও পার না, আমিও না। তাই লোকে আমাদের কাছে কিছু আশা করে। কিছু পেতে চায়। কী প্রচণ্ড তামাশা!" ক্ষোভ নয়, ঘৃণা নয়, দুঃখও নয়, জীবনে এই প্রথম ঈশ্বরের প্রতি তার মমতা জাগল।

ম্যানেজারের ঘর থেকে তাড়া খেয়ে বেরিয়ে আসা কাপুরুষ সহকর্মীটির প্রতি কিছুক্ষণ আগে তার মনে অবিকল এই রকম একটা মমতার ভাব জেগেছিল। তার মত ঈশ্বরকেও স্বজাতি বলে লোকটার মনে হতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে একটু আরাম পেল।

বেলা গড়িয়ে গেল। অফিসের ছুটি হল। সহকর্মীরা ভাবল, অন্য দিনের মত সে বুঝি ওভারটাইম করছে। সন্ধ্যে হল। বেয়ারা যাবার সময় ঘরের চাবিটা রাখতে এসে জিজ্ঞাসা করল, "বাবুর কি শরীর খারাপ হয়েছে?" সে মাথা না তুলেই জবাব দিল, "না।" বেয়ারা জানিয়ে দিল, "সাহেব চলে গেলেন। আপনার কি রাত হবে?" সে বলল, "হ্যাঁ, কাজ একটু বাকি আছে।" বেয়ারা বাক্য ব্যয় না করে চলে গেল।

একেবারে একা হয়ে সে ভাবল, সহকর্মীদের নামগুলো সাহেবের হাতে তুলে দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বোমার ঘায়ে এই অফিসটা উড়ে যাবে, যদি সে নিশ্চিতভাবে এ খবর জানতে পারত, তাহলে তাকে আজ এত দ্বিধার মধ্যে থাকতে হত না। অনেক নিশ্চিন্তমনে সে সাহেবের হাতে তালিকাটা তুলে দিতে পারত। কিন্তু তার পরেও যে তাকে অফিসে আসতে হবে, সাজা পাওয়া ওই লোকগুলোর জোড়া জোড়া ভোঁতা দৃষ্টি গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে তাকে অস্থির করে দেবে। সেই স্থির চোখগুলো ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে রোজ অফিসে এসে বসার কথা

ভাবতেই তার শরীর শিরশির করে উঠল। তবে কি সে পদত্যাগ করবে? তাকে টিপে টিপে মারবার সুযোগটা ম্যানেজারকে আর দেবে না? সাহেব তার কিছুটা উপকার করেছিলেন। তা কি এতদিনে সুদ সমেত উশুল করে নেননি সাহেব? অতিরিক্ত খেটে, যখন-তখন অপমান সহ্য করে, সাহেবকে প্রভুত্বের আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগ দিয়ে সে কি তার ঋণ চতুর্গুণ ফিরিয়ে দেয়নি? মানুষ হিসাবে তার পরিচয় হয়ত দিতে পারেনি, হয়ত কেন, সত্যিই পারেনি। তাই বলে তাকে কি এখন কুকুরের প্রভুভক্তির প্রমাণ দাখিল করে আত্মরক্ষা করতে হবে? তারই মত অসহায় আর গোটাকতক ফুটো-জাহাজের-ইঁদুরের ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাঁচবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে? এবং তাইতেই যে সে পার পাবে, লোকটা এ কথাই কি বুক ঠুকে বলতে পারে?

তার চেয়ে লোকটা বরং পদত্যাগপত্র দাখিল করুক। সে গ্লানিমুক্ত হবার জন্য একবার অন্তত রুখে দাঁড়াক। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ ইচ্ছেটায় সে যেন তেমন জোর পেল না। এটা একটা বিরাট ঝুঁকি। কোনও ছা-পোষা লোকই কি স্বেচ্ছায়, ঠাণ্ডা মাথায় এই রকম একটা ঝুঁকি নিতে পারে? খড়কুটো কুড়িয়ে তৈরি করা কোনও একটা আদর্শকে টেনে এনে সে যদি এর পিছনে দাঁড় করাতে পারত, কোন রকম একটা লেবেল, দেশ হোক, জাতি হোক, ধর্ম হোক, মতবাদ হোক—দোহাই পাড়ার মত কোন রকম একটা মূর্খামীর সমর্থন যদি সে জোটাতে পারত, তাহলে, লোকটার মনে হল, এই ঝুঁকি নেওয়াটা তার পক্ষে সহজ হত। সে যে নিতান্তই সাধারণ মানুষ। কোনও একটা

নেশায় সাময়িকভাবে বুঁদ না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে কোনও রকম হঠকারিতাই করা সম্ভব নয়, অন্ধ না হতে পারা পর্যন্ত যে তার চোখে মা, বউ, ছেলেমেয়ের মুখগুলো অহরহ ভাসে। এ এক মহা জ্বালা!

অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় গুঁজে বসে থাকায় তার পিঠ টনটন করছিল। নিজেকে তার খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। মাথার মধ্যে যেসব প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে, লোকটা সেগুলো মুছে ফেলতে চাইছিল। কি দিয়ে মগজের ভাবনা মুছে ফেলা যায় সেটা খুঁজতেই লোকটা মাথা তুলেছিল। তারপর চোখ খুলতেই সে তো অবাক। সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "আরে তুমি!"

নগর পরিষদ স্কুলের সেই শিক্ষিকা লোকটার ভাব দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল, "খুব চমকে দিয়েছি তো!"

লোকটাও হেসে উঠল। বলল, "ওঃ, দারুণ। কখন এলে একেবারে টের পাইনি কিনা।"

মেয়েটা বলল, "এমন তন্ময়, টের পাবে কি করে। আমি ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছ। কুঁজো-টুজো ঘরে থাকলে নির্ঘাৎ জল ছিটিয়ে দিতাম।"

লোকটা চোখ ভরে মেয়েটাকে দেখতে লাগল। তেমনি সুন্দর আছে। না না, আরো অনেক সুন্দর হয়েছে। আগে ওর মুখে একটা বিষাদের ভাব মাখানো থাকত। ওকে অনেক ক্লান্ত দেখাত তখন। এখন সারামুখ উচ্ছলতায় টলটল করছে।

লোকটার খুব ভাল লাগল। মেয়েটা টিপে টিপে হাসছে। ওর চোখে-মুখে এত হাসি তখন বোধ হয় ছিল না।

মেয়েটা খুব নরম গলায় বলল, "কি অত দেখছ?"

লোকটা আস্তে বলে উঠল, "তোমাকে। কতদিন পরে, উঃ! ভাবতেই পারিনি, আবার এমনভাবে দেখা হবে।"

মেয়েটা বলল, "তবু দেখ, আমিই এলাম।" মেয়েটি এবার তাকেই যেন বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, "তুমি কিন্তু সেই একই রকম আছ। ভাবনার মোটটা আজও ঘাড় থেকে নামাতে পারনি। না, ভুল বললাম, তুমি বদলেছ। ও মা, এ কী, তোমার চুলে যে পাক ধরেছে।"

"তাই নাকি!" লোকটা অস্বস্তি বোধ করল। মেয়েটা তার পাকা চুল দেখে ফেলুক, এটা সে এখন চাইছিল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "হবে হয়ত। তারপর তুমি কেমন আছ? তোমার মা?"

মেয়েটা হাসতে লাগল। "মা? কবে মারা গেছেন।"

লোকটা একটু অবাক হল। কেমন হাসতে হাসতে ও মায়ের মৃত্যুর খবরটা দিচ্ছে।

"অথচ মজা দেখো, আর যদি মাত্র চারটে মাস আগে মা মরতেন", মেয়েটা তেমনি হাসতে হাসতে বলতে লাগল, "তাহলে আমি শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যানের মুখে জুতো মেরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আসতে পারতাম। চাকরিটা রাখার জন্য আর ওর বিছানায় গিয়ে ইনটারভিউ দিতে হত না, কিংবা আমার বিছানাতেও ওকে ডেকে আনতে হত না। তাহলে তোমার সঙ্গেও আর ছাড়াছাড়িটা হত না।" মেয়েটা তেমনি হাসতে

লাগল। "অথচ চেয়ারম্যানের ব্যাপারটা নিয়ে তোমার মত মাও কিন্তু আমাকে ঘেন্না করতে শুরু করেছিল। যার জন্য চুরি করি সেও বলে চোর।" খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটা।

লোকটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, মেয়েটা হাসি দিয়ে তা থামিয়ে দিল। "আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছিনে। তুমি যে অবস্থায় আমাদের দেখেছিলে, তাতে যে-কেউ আমাকে ঘেন্না করতে পারত। তবে তোমাকে সত্যি কথাটা বলি, সেদিন কিন্তু খুব নির্দোষ খেলাই চলছিল। তিনি ধেড়ে বাছুরের মত আমার পালানে শুধু ঢুঁ মারছিলেন। আর কিছুই করেননি। আর আমি ওঁর পাকা চুল তুলে দিচ্ছিলাম।" মেয়েটা সকৌতুকে খিক খিক করে হাসতেই লাগল। লোকটার মনেও সেই হাসির সংক্রমণ অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়ল।

"তাই নাকি?" সে হাসতে লাগল।

"সত্যিই তাই।" মেয়েটা হাসতে লাগল।

"আর আমি, জীবনে তোমার ছায়া মাড়াব না, এই প্রতিজ্ঞা করে পিঠটান দিলাম।" লোকটা হাসতে লাগল।

"আর আমি, চেয়ারম্যানের টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে প্রধান শিক্ষিকার পদটা আবার ফিরে পেলাম, শুধু সেখানেই থামলাম না, স্কুল ইন্‌সপেকট্রেসের চাকরিটা পাকা করে নিলাম।" মেয়েটা হাসতে লাগল।

লোকটা বলল, "তাই নাকি?" হাঃ হাঃ হাঃ।

মেয়েটা বলল, "তবে কি।" হাঃ হাঃ হাঃ।

"এত সোজা?" হাঃ হাঃ হাঃ।

"এ-ত সোজা।" হাঃ হাঃ হাঃ।

"আর আমরা কি না," লোকটা হাসতে হাসতে বলল, 'কত সব আজেবাজে ভাবনায় দিন কাটিয়েছি।"

"রেস্তোঁরায় বসে বসে," মেয়েটি মনে করিয়ে দিল।

"ময়দানে কেল্লার দিকে পিঠ ফিরিয়ে," লোকটা সায় দিল।

"লেকে", মেয়েটি বলল।

"বোটানিকসে, ব্যানডেল চারচের মাঠে", লোকটা জবাব দিল।

"এমন কি আধো অন্ধকারে আমার ঘরে বসে," মেয়েটি ফিসফিস করল।

"তোমাকে ছুঁইনি—"

"একটা দিন চুমুও খাইনি—"

"শুধু পরামর্শ করেছি, শুধু প্রতিজ্ঞা নিয়েছি ফাইট করব—"

"অন্যায়ের, অবিচারের, অপমানের শোধ তুলব—"

"মাথা তুলে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াব—"

"ভাঙব, গুঁড়িয়ে যাব—"

"তবু মচকাব না, মেরুদণ্ড বাঁকাবো না—"

"কিন্তু তারপর," মেয়েটির কণ্ঠ অত্যন্ত ক্লান্ত, অত্যন্ত বিষণ্ন শোনাল।

"কিন্তু তারপর" লোকটা ছটফট করে উঠল, "মাথা নিচু করে আবার গিয়ে কাজে বসেছি।"

"চেয়ারম্যানের খাটে গিয়ে আবার উঠেছি।" মেয়েটি যেন ভেঙে পড়ল।

"ন্যায়-অন্যায় নির্বিচারে," লোকটার বুকে অত্যন্ত যন্ত্রণা হতে লাগল, থরথর করে ঠোঁট দুটো প্রচণ্ড অভিমানে কাঁপতে লাগল,

কাতরাতে কাতরাতে সে বলে গেল, "হুকুম তামিল করে গিয়েছি। তবুও অস্থায়ী চাকরি স্থায়ী করতে পারিনি। আমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার আগে সেই অস্থায়ী চাকরিটাও নিজের থেকে ছাড়তে সাহস পাইনি।"

মেয়েটির মুখের দিকে আর সে চাইতে পারছিল না। দু' হাতে মুখ ঢেকে সে টেবিলে মাথা রাখল।

"অথচ চারমাস আগে আমার মা, পঙ্গু, অথর্ব মা যদি গত হতেন, হয়ত আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারতাম।" লোকটার মনে হল নগর পরিষদের স্কুল ইন্‌সপেকট্রেস ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পারতে না, লোকটা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, পারতে না, মেরুদণ্ড এমন জিনিষ, একবার যদি নুইয়ে ফেল, আর সোজা করা যায় না। এ একটা এমনই অদ্ভুত জিনিষ। লোকটার চোখ-চাপা হাতের তালু দুটো ভিজে সপসপ করতে লাগল।

এ-ও আরেকজন, লোকটা ভাবল, তারই মত পরাজিত, তারই মত প্রহারে প্রহারে জর্জরিত, তার স্বজাতি, তারই আপন জন। তার ইচ্ছে করতে লাগল মেয়েটির হাত দুখানা ধরে তাকে একটু সান্ত্বনা জানায়। একটিবার তাকে বুকে টেনে নেয়। সে মাথা তুলল না, কিন্তু টেবিলের যেখানে হাত রেখে মেয়েটি বসেছিল, সেইখানেই তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল। হাতখানা এমনিই ফিরে এল। সে তখন দুহাত দিয়ে টেবিলটাতে আতিপাঁতি করে খোঁজ শুরু করল। কোনও শরীরই সে ছুঁতে পারল না। বুঝতে পারল, কেউ নেই। বিড়বিড় করে বলে উঠল, "আমি এখন একা। আবার আমি

একা।" আবার সে বোধ করল, তার পায়ের নিচেকার মাটি পিছলে সরে যাচ্ছে। "না," সে এবার ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "সব মাটি সরে যাবার আগেই আমাকে একটা আশ্রয়ে পৌঁছতে হবে। কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এভাবে আর শূন্যে ঝুলতে পারি নে।"

হঠাৎ তার বাড়ির কথা মনে পড়ল। স্ত্রীর শরীরে সাময়িক-ভাবে একটা আশ্রয় মিলতে পারে। লোকটা এর আগেও দেখেছে, যখনই সে হালে পানি পায়নি, মগজের যন্ত্রণাদায়ক চিন্তাগুলোকে কোন কিছু দিয়েই স্তব্ধ করতে পারেনি, তখনই সে স্ত্রীর দেহে আশ্রয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তাগুলোকে প্রাণশক্তির সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে স্বাভাবিক নালিপথে বের করে দিয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত হয়েছে। এ ছাড়া এখন তার কাছে যন্ত্রণা লাঘবের আর কোন পথই খোলা নেই।

তাই সে মাথা না তুলেই বলেছিল, "বাড়ি যাই।" আর সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবার প্রচণ্ড একটা তাগিদ লোকটা অনুভব করেছিল। কারণ একটু রাত হতে না হতেই সারাদিনের অক্লান্ত খাটুনিতে পরিশ্রান্ত তার স্ত্রীর শরীরটা বিছানায় এলিয়ে পড়ে। তখন তাকে তৈরি করে নিতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। সে এক এলাহি ব্যাপার। প্রথমে লোকটাকে তার স্ত্রীর পায়ের তেলোয় সুড়সুড়ি দিয়ে, বগলে, ভুঁড়িতে অনেকক্ষণ ধরে কাতুকুতু দিয়ে তবে ঘুম ভাঙাতে হয়। তারপর ঠেলেঠুলে কোনমতে তাকে বসিয়ে দিতে হয়। তারপর তাকেই অগ্রণী হয়ে বাইরের জামা ভিতরের জামা শাড়ি সায়ার খোলসের ভিতর থেকে নির্ভেজাল স্ত্রীটাকে টেনেটুনে বের করে আনতে হয়।

তাকেই ট্যালকম পাউডারের কৌটোটা ড্রেসিং আয়নার দেরাজ থেকে বের করে এনে বউয়ের বুকে পিঠে ছড়িয়ে দিতে হয়।) আর তিনি শুধু ঘটেশ্বরীর মত খাটুম মেরে বসে বসে ঢুলতে থাকেন। আর এদিকে ওদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েন। অধিকাংশ দিনই এমন হয়েছে যে এই ঝামেলা শেষ হতে না হতে লোকটার শরীর ক্লান্তিতে গোত্তা খেয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়েছে এবং অতঃপর দুই তাল মাংসপিণ্ডকে শীতলতার কাছে চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে বাকি রাতটুকু কাটাতে দেখা গিয়েছে। সেই-জন্যই লোকটা সেদিন তার স্ত্রী ঘুমে ঢুলে পড়ার আগেই বাড়ি পৌঁছুতে চেয়েছিল বলে মনে হয়। সেদিন সে আর কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাইছিল না। অনেকক্ষণ ধরে একভাবে বসে থাকায় তার ঘাড়পিঠ ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। কোমরের কাছে প্রচণ্ড খিচুনি অনুভব করছিল। মাথার ভিতরে প্রচণ্ড শক্তির একটা বালব্ অনবরত জ্বলছিল আর নিবছিল। লোকটা ভাবল, আর না, এইবার উঠি। এখনই তার ওঠা উচিত।

৪

লোকটা মরীয়া হয়ে বারকয়েক উঠবার চেষ্টা করল। পারল না। তাকে কে যেন গাড়ির সীটটার সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে এঁটে রেখেছে। তার ক্রমশ ঘুম এসে যাচ্ছে। মাথাটা কিছুক্ষণ ধরেই বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। ড্রাইভারকে আর দেখতে পাচ্ছে না। বাইরে যারা পিলপিল করছিল তাদেরও না। কোন সংলাপই আর আলাদা করে তার কানে ঢুকছে না। কথাগুলো সব মিলেমিশে সমুদ্রের চাপা গর্জনে পরিণত হয়ে পড়ছে। এতক্ষণে তার কানে সিটির মত একটানা একটা তীক্ষ্ণ স্বর বাজতে শুরু করল। বেজেই চলল। তার মনে হল, তার মগজের মধ্যে একটা ইঞ্জিন বোধ হয় সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তারই বাষ্প বেরিয়ে যাবার ধারালো শিষটা তার মাথাটাকে যেন ফালা-ফালা করে চিরতে লাগল। বাড়ি যাব, আমি বাড়ি যাব। হঠাৎ তার শরীরে প্রচণ্ড জোরে একটা খিঁচুনি হল। লোকটার মনে হল একটা ঝাঁকানি খেয়ে আকাশটা অনেক নেমে এল।

তার ভিতর থেকে একটা বুদবুদ বেরিয়ে এল। বাড়ি যাব। আবার একটা খিঁচুনি, এবার আরও জোরে। আকাশও আরেকটা ঝাঁকিতে তার উপর অনেকখানি নেমে এল। একেবারে তার নাগালের মধ্যে। সে কাছ থেকে খুব খুঁটিয়ে আকাশটাকে দেখল। কোথাও একটা নক্ষত্র নেই। অবিকল পুলিশের অয়্যারলেস ভ্যানের মত কালো।

পুলিশ ভ্যানটাই উদ্যোগ করে অ্যামবুলেন্স আনিয়ে নিল। ইনসপেকটার প্রবল প্রতাপে ভিড় সরিয়ে দিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহে মন দিল। অ্যামবুলেনসের লোকেরা পেশাদারি দক্ষতায় স্ট্রেচারে করে তাকে যখন গাড়ির ভিতর শুইয়ে দিল, তখনই লোকটার শরীরে খিঁচুনির প্রচণ্ডতম ঢেউটা গুঁতো মারল আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশটা আরেক ঝাঁকিতে তার দেহটার উপর খ্যাপলা জালের মত ছড়িয়ে পড়ল। অ্যামবুলেনসের কর্মী লোকটার আপাদমস্তক কম্বল চাপা দিয়ে ঢেকে দিল।

হাসপাতালের এমারজেনসিতে ডাক্তারবাবু লোকটাকে ভাল করে একবার পরীক্ষা করলেন। তারপর রেকর্ড বইটা খুলে খসখস করে লিখে রাখলেন ঃ মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তারপর ডোমেদের অভ্যাস বশেই বললেন, "ওরে লাশটার পকেটগুলো ভাল করে ছ্যাখ। যা পাস নিয়ে আয় এখানে। লিসটি করে রেখে দিই। তারপর ওটাকে নিয়ে যা। গাদায় রেখে দে।"